ISSN No. 2277-8942

পইঠা

(সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা)

Paitha

(A Socio-Cultural and Literary Peer-Reviewed Research Journal)

চতুর্দশ বর্ষ

২০২৪

সম্পাদক

জাহ্নবী দাশ ভট্টাচার্য

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ISSN No. 2277-8942 চতুর্দশ বর্ষ ২০২৪

সূচি

তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প : মহানগরে নারীযাপন
রমা দাস ৫-১২

কালচক্রের গতিময়তায় বর্ণ-বৈষম্যের অভিঘাত ও ক্ষমতার উত্থানপতন : রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি'র আলোকে
বরুণ কুমার সাহা ১৩-২২

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ভিন্নধর্মী উপন্যাস 'কান্তকবি' : সমকালীন বাঙালি কবিসমাজের প্রতিবিম্ব
মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ ২৩-৩৭

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পে নারী চরিত্র : মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আলোকে
দীপশিখা দাস ৩৮-৫৯

কিনু গোয়ালার গলি : মধ্যবিত্ত চরিত্রের আত্মানুসন্ধান-অন্তর্বিশ্লেষণের পরিচয়
অশোক কুমার রায় ও শিপ্রা গুহ নিয়োগী ৬০-৭১

সত্যজিতের গোয়েন্দা সাহিত্যে তোপসের (তপেশরঞ্জন মিত্র) ভূমিকা
রাহুল দে ৭২-৮২

মহাভারত কাহিনির পুনর্নির্মাণ : বুদ্ধদেব বসুর *সংক্রান্তি*
প্রানজিৎ সরকার ৮৩-৯৬

মহাপুরুষ জীবনভিত্তিক অসমিয়া উপন্যাস : সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'ধন্য নর তনু ভাল'
রেশ্মী বীর ৯৭-১১৪

মহাপুরুষ জীবনভিত্তিক অসমিয়া উপন্যাস : সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'ধন্য নর তনু ভাল'

রেশ্মী বীর
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The first element to be chosen in writing any novel is the plot. In this plotting, novelists usually focus on a main theme or event and gradually present the whole novel in an industrialized form. In the novel 'Dhanya Nar Tanu Val' discussed by Syed Abdul Malik, the subject matter on which the novelist proceeds is the natural form of events and experiences. India is a religion centric country; the greatness of religion is abundant in this country. Just as there are miracles in this country, there are also stories of divine birth Based on religion. The novel is built on the Vaishnava ideology of Srimanta Sankaradeva of medieval Assam, one of the most brilliant protagonists of the Bhakti movement. In order to develop the character of epoch-maker Shankardeva, Syed Abdul Malik has beautifully described the pre-history of Assam and the national atmosphere of the time. Shankaradeva's Krishna devotional nature developed the insatiable appetite of thousands of people into an abundance of knowledge. The novel is interspersed with several subplots in terms of narrative pacing. These subplots are able to give the novel a lively rhythm. The plot of the novel is constructed in simple and compound lines. The novel 'Dhanya Nar Tanu Bhal' is written in compound mode. The main story of the novel runs parallel to its purpose while the subplots extend its excellent structure by connecting the main events. For example, the dialogues of Bajru, Tapar, Banhganthi in Volume II suggest that Shankaradeva's secular attitude was sufficient for the livelihood of common people. The seed of religion is not destroyed by the people of society like Kaivarta, Garia Muslim etc. The ideal between devotees and devotees is humanity Where 'Gopal Bola, Kripal Bola are adorable each other' This new ideal of Vaishnava society based on equality and humanity was full of devotion. The words of Hari Bhakti-Vani bound all classes of people like Kacharis, Maranas, Ahoms, Miris, Kalitas, Brahmins, Diviners, Muslims, Buddhists, Parvatiyas, Kaivartas, Chandals etc. Shankaradeva was the leading man. To highlight his own philosophy, the author takes the help of the magical power of writing - imagination which is the first weapon of literature. The greater the imagination, the greater the excellence of his writing As a

result, 'Dhanya Nara Tanu Val' author's kalpa-prachar has been able to shape a great endeavor in modern Assamese literature. His thoughts towards religion were neutral, so in this novel he has made Shankaradev's pursuit into a mad artistic pursuit. Shankaradeva's character and his quality of life are well brought out. The ideal of the world is the change of emancipated people the pantheist philosophy of the Bhakti movement tied Assam to India in a spiritual bond. Shankaradeva's Naamdharma and Eksaranavad is popular perception of interesting works. His advice, the simple ideal is the sheltered form of the Vaishnavite umbrella The novel written with a sense of imagination and practical responsibility is a new masterpiece of Assamese literature and civilization We are going to evaluate his own artistic works in the discussion research paper.

Seed Words: *Novel, Mahapurusha, Medieval, Assamese, Assamese*

১. ভূমিকা:

শ্রীমন্ত শংকরদেব জীবনভিত্তিক উপন্যাসের রচনাকার সৈয়দ আব্দুল মালিক রচিত 'ধন্য নর তনু ভাল' উপন্যাসটির একপ্রকার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার মধ্যে তাঁর সাহিত্যকর্মের বৃহৎ পটভূমিকাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মালিক একজন অসমিয়া লেখক। তিনি তাঁর দক্ষতায় শ্রীমন্ত শংকরদেবের চরিত্রটিকে অনন্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ধন্য নর তনু ভাল' উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছেন রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাকে। আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যে মালিক একেধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ভ্রমণ-কাহিনির লেখক, নিবন্ধকার, সাহিত্যের গবেষক, ভাষাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ছিল মানবপ্রেম। ড০ নগেন শইকীয়া তাঁর সম্পর্কে বলেছেন— 'সৈয়দ আব্দুল মালিক এই নামটো ব্যবহার নকরাকৈ আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যর আরু আধুনিক অসমিয়া জাতির ইতিহাস রচনা করিব নোয়ারি। কি বিপুল সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ারে এইগরাকী অসমিয়াই অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য, তথা আমার জাতীয়জীবন সমৃদ্ধিশালী করি থৈ গৈছে সেই কথা ভাবিলে বিস্মিত লাগে। আধুনিক কালর সৃষ্টিশীল প্রতিভার সবাতোকৈ ওখ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বর অধিকারী সৈয়দ আব্দুল মালিক।'

বিশ শতকের একজন বিখ্যাত অসমিয়া কথাসাহিত্যিক হলেন সৈয়দ আব্দুল মালিক। উপন্যাস রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অসমিয়া সাহিত্যে রামধেনু যুগ ছিল চেতনাপ্রবাহের যুগ। বাস্তববাদী এবং প্রগতিবাদী ধারায় আধুনিকতার নতুন স্তর তৈরি হয়েছিল। এই যুগটি মূলত বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রচারিত। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অসমিয়া সাহিত্যে নতুন শক্তির যোগান ধরে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা ও ছোটগল্পের রচনাতে ছিল সমাজবাদী চেতনার প্রভাব। এই যুগের সংগ্রাম

তথা বৈপ্লবিক ভাবনাই ছিল লেখার প্রেরণাত্মক বিষয়। সমাজবাদী মনোভাবের সঙ্গে নব্য রোমান্টিক চেতনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা প্রবল প্রসার লাভ করে। উদ্বুদ্ধ হয় নান্দনিকতার সৌন্দর্যবোধও। ফলে রামধেনু যুগে দুইটি দলের পরিচয় পাওয়া যায়— একদল ছিল সমাজবাদী চিন্তার। আরেকটি দল হল প্রতীকবাদী এবং নব্য রোমান্টিক ধ্যান-ধারণার প্রসূত রূপ। অসমিয়া সাহিত্যকে বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করার জন্য হেম বরুয়া, সৈয়দ আব্দুল মালিক, বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, নলিনীধর ভট্টাচার্য, কেশব মহন্ত, রাম গগৈ, হীরেন ভট্টাচার্যের ভূমিকা ছিল প্রচুর। তাঁদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন এলিয়ট। এই যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি ছিলন হীরেন ভট্টাচার্য। যিনি গীতিধর্মের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রামধেনু যুগের এই প্রথম দলটির উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যের ঐকান্তিক প্রীতিবোধে লোকজীবনকে নতুন রূপে তুলে ধরা। এই মনোভাবে পরিপুষ্ট মালিকের রচনা অনুভূতির সুক্ষ্ম ও সংযত বর্ণনায় সমৃদ্ধবান। রোমান্টিক স্বপ্ন, নর-নারীর যৌন সম্পর্কের বিশ্লেষণ তাছাড়া জীবনবোধ এবং মানবতাই ছিল তাঁর রচনার মূল বিষয়। সাহিত্যে তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবিত রূপ হল 'ধন্য নর তনু ভাল' উপন্যাসটি।

২. উদ্দেশ্য:

শাশ্বত ভারতবর্ষের হৃদয়ে জীবনশিল্পী শংকরদেবের আবির্ভাব প্রাচীন এবং আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয়ে বহুপূর্বেই মধ্যযুগীয় ভাগ্যাকাশকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত' প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত করেছিল। যাঁর স্বদেশ ভাবনায় দর্শিত সর্বভারতীয়স্তরের ভক্তিনীতির আদর্শ আজও দেশ, সমাজ, পৃথিবীর প্রতি মূল্যবোধটিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা যোগায়। তারই উদ্দেশ্যে রচিত সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'ধন্য নর তনু ভাল' অসমিয়া সাহিত্য জগতের অম্লান সৃষ্টি। 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' মূলমন্ত্রে ভারতবর্ষের মহামানবিক জীবনসত্তায় শংকরদেবর জীবন জ্যোতির উদ্ভাস সাহিত্য জগতে অদ্ভুত রসস্পৃহার যোগান ধরে। ইতিহাসকে সাক্ষ্য রেখে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভূগোল তৈরি করায় সৈয়দ আব্দুল মালিকের ধ্যান-ধারণা এবং যুক্তিপূর্ণ মনো-বিশ্লেষণীর আধারে রচিত উপন্যাসটি এই গবেষণার উৎসমুখ।

৩. গ্রন্থ পরিচয়:

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের জীবন-আধারে রচিত সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'ধন্য নর তনু ভাল' (১৯৮৭) উপন্যাসটির আঙ্গিকে অসমীয়া সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের মানবীয় দৃষ্টিভংগীকে উপন্যাটিতে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসটিতে মহাপুরুষ শংকদেবের শিল্পী সত্তার মননশীল উপস্থাপন পাওয়া যায়।

৪. গবেষণা-পদ্ধতি:

গবেষণা-পত্রটি প্রস্তুত করতে গিয়ে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূল উৎস হিসেবে আকর গ্রন্থ এবং গৌণ উৎস-রূপে বেশ কয়েকটি সহায়ক

গ্রন্থরাজির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উক্ত তথ্যসমূহের সহায়তায় গবেষণা-পত্রটিকে একটি সু-সামঞ্জস্য ও পদ্ধতিগত গবেষণায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. মূল আলোচনা:

ভক্তি আন্দোলন ছিল মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় আন্দোলন। যার উদ্দেশ্য ছিল ভক্তি পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজের সকল স্তরে ধর্মীয় সংস্কারের চেষ্টা করা। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এর প্রভাব উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে বৈষ্ণব আলভার এবং শৈব নয়নারদের কবিতা ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রাধান্য লাভ করে। ১৫ শতকের পর থেকে এটি পূর্ব ও উত্তর ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, ১৫ এবং ১৭ শতকের মধ্যে তার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। কালক্রমে ভক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী কাহিনিই হয়ে উঠল বিভিন্ন লেখকদের রচনার বিষয়বস্তু। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা শ্রীমন্ত শংকরদেবের স্বরগ্রাম খোঁজায় অসমিয়া সাহিত্যের যে গ্রন্থটিকে বেঁছে নিয়েছি সেটি হল ঔপন্যাসিক সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'ধন্য নর তনু ভাল।'

উপন্যাসটির নায়ক হলেন মধ্যযুগের। উপন্যাসটি ভাবে, ভাষায়, আলোচনায় আধুনিক যুগের নিদর্শন। কথাশিল্পী সৈয়দ আব্দুল মালিকের আজীবন সাহিত্য সাধনার পূর্ণ প্রতিফলন হচ্ছে 'ধন্য নর তনু ভাল'। মধ্যযুগের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসটির প্রতিটি ছত্রে শ্রীমন্ত শংকরদেবের আধুনিক যুগের মহামানব স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানেই ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক পরিচয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান।' ঔপন্যাসিক সৈয়দ আব্দুল মালিকের রচনাসূত্রও ছিল তাই। আমরা জানি উপন্যাস হল বাস্তব জীবনের প্রতিভূ। এখানে গল্পের মতো ঠাট-বুনন নেই। থাকে মানুষের জীবনের গল্প । 'যারা বাস্তবের অন্নেবস্ত্রে মানুষ।' অসমিয়া উপন্যাসেও সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশের বহুধা রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত, সাহিত্যে রেনেসাঁসের ফলে নানান শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। বিশ শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসে বৈচিত্রময় প্রতিভার সৃষ্টি হয়। আমাদের ভারতবর্ষে উপন্যাস উৎপত্তির মূলে রয়েছে ইংরেজি উপন্যাস। তাছাড়া, মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলিতেও মানুষের জীবন-সংগ্রামের প্রচুর কাহিনি পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে সাহিত্যে মানুষের স্বাদের পরিবর্তন ঘটে। মানুষ সোজাসুজি কথা বলতে ভালোবাসে। 'বাস্তব মানুষের কাহিনি চরিত্র ও চরিত্রঘটিত দ্বন্দ্বই হল উপন্যাস সাহিত্যের মৌলিক লক্ষণ।'[১] ড০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথাটির ওপর নির্ভর করে উপন্যাসে বাস্তবতার ভিত্তিটিকে শক্ত করে দাঁড় করানো যায়। কিন্তু কেবল যদি বাস্তবই থাকে তবে সেখানে ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্ব কোথায়! লেখকের লেখায় অনুভূতি ও আবেগই হল রচনাশক্তির প্রাণ। বাস্তবতার সুর সম্বলিত ভাবনার প্রাচুর্যই সাহিত্যের কায়া। সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ দেখে মন

যেমন আনন্দে উছলে ওঠে, এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন অনিন্দ্য সুন্দরতায় সত্যকে আহ্বান করা। সাহিত্যে এই আহ্বানের প্রয়োজন। কল্পনার তীক্ষ্ণ প্রসারতায় সাহিত্য একটি বৃহৎ মনোবৃক্ষে পরিণত হয়। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—' কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা যুক্তি, সংযম ও সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ। কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশায্য অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোর রেশ আছে ধূমের অংশ তাহা শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে; কারণ ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।' সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুভূতি, আবেগ, কল্পনার উচ্ছ্বাস যেমন ঠিক তেমনি প্রয়োজন ভাষার রীতি, গঠনের বুনন, প্রয়োগরীতি ইত্যাদির।

শচীশ সেন, 'রবীন্দ্র সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ বলেন যে সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি।' সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কেবল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখি না, বরং এক সাহিত্যের সঙ্গে অপর একটি সাহিত্যের ভাব-চেতনায় মিলনের স্রোতকেও বুঝি। উপলব্ধির নিবিড়তায় কেবল সাহিত্য নয়, শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান সবকিছুই গড়ে ওঠে। প্রকাশের ধারা, অন্তরের অনুভব মানুষকে কৌতুকপ্রিয় থেকে আবিষ্কারকর্তায় পরিণত করে। যে সমাজে কল্পনা নামক বস্তুটি নেই সেই সমাজের অনুভব শক্তিও কম। কাজে যারা কল্পনা করতে পারে না তাদের ভবিষ্যতও নেই। এই কল্পনা প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ প্রগতিশীল, উন্নতমান ও আত্ম-সচেতন। প্রাণের সঙ্গে নতুন সত্তার পরিচয়ে আমরা সকলেই চির-উন্মুখ প্রবৃত্তির জীব। মনের কথাগুলি প্রকাশ করার জন্য সবসময়ই তৎপর হয়ে থাকি। পরিণত কল্পনার সুবিচারে সংযত আত্মিক রূপটিই হচ্ছে সাহিত্য এবং এই সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে উপন্যাস হচ্ছে অন্যতম রূপ।

'ধন্য নর তনু ভাল' উপন্যাসটির কাহিনি অগ্রসর হয়েছে শ্রীমন্ত শংকরদেবের জীবনীকাহিনি নিয়ে। সৈয়দ আব্দুল মালিক মধ্যযুগের নায়কোচিত চরিত্রটিকে একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে উপস্থাপনা করেছেন। তিনি শংকরদেবের জন্মের বহুপূর্বের ইতিহাসটিকে ব্যাখ্যা করে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে তুলে ধরেছেন। এক অর্থে ঔপন্যাসিক সময়কে সঙ্গী করে অসাধারণ শিল্পচেতনায় মহাপুরুষের জীবনকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর রচনার ভিত্তি ছিল কল্পনা, সত্য, প্রতিষ্ঠা।

আমরা মানুষ বুদ্ধির প্রয়োগে ভাষার ব্যবহারে সেই ভাষাকে রূপ দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা কিংবা অনুভব জাহির করে চলছি। এক্ষেত্রে, মানুষের সঙ্গে যদি অন্যান্য জীবের তুলনা করা যায় তবে একটু নজর দিলেই আমরা দেখি যে 'ভাব' নামক জিনিসটি সকলের মধ্যেই অল্প-বেশি পরিমানে রয়েছে। একমাত্র আমরা এই ভাবশক্তিকে রূপদান করে কল্পনার বৃহৎ মঞ্চকে নিত্য নতুনরূপে সাজিয়ে তুলছি। ভাবেই গড়ে উঠে জ্ঞান। জ্ঞানে জন্মে ভক্তি।

সৌন্দর্যের স্পর্শে পৃথিবীর অবর্ণনীয় পার্থিব সম্পত্তিকে অপার্থিব সম্পদে মহান স্রষ্টার চিরসুন্দর রূপটিকে তুলে ধরে মানুষ। তাই মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। পৃথিবী জন্মের প্রথমভাগ অন্ধকারে ডুবেছিল, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ব্যবধান ছিল অজ্ঞানের ঠিক তেমনি তার বিপরীত দিকটি ছিল উপলব্ধি তথা আনন্দের, অভ্রান্ত অস্বাদের অমৃত তৃষাতুর জীবনের। বেদ, উপনিষদের মধ্যে আমরা শুনতে পাই জ্ঞানের সেই সোণালী মন্ত্র। মহত্বের অতুল চেতনায় মানুষের আহ্বান—

"অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতংগময়
ওঁম শান্তি শান্তি শান্তি..."

আজও এই মন্ত্রটির আধ্যাত্মিক সত্তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত করে। সৈয়দ আব্দুল মালিক অসমের অমূল্য রতন শ্রীমন্ত শংকরদেবের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ভাবটিকে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। চেতনা এবং কল্পনার মিশ্রণে তাঁর রচনার গভীরতাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। শ্রীমন্ত শংকরদেবের বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-জ্ঞান শুধু মানুষের জীবনের মূল্যবোধটিকে বাঁচিয়ে রাখে না বরং তাঁর মানবপ্রেমী 'একশরণ' ধর্মের বিশ্বাস ভারতবর্ষের মানুষকে সর্বপ্রথম অহিংসার পথ দেখায়। জাত-পাতের বিচার, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় নীতিতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার। সামাজিক ন্যায় এবং মানবতাবাদ, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা মানুষের জীবনের কৃতকর্মের পন্থাগুলিকে সার্বজনীন রাষ্ট্রধর্ম ও রাষ্ট্রবিধিতে পরিণত করেছিল। সারা ভারত জুড়ে তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব ছিল অতুলনীয়।

"পরর ধর্মক নিহিংসিবা কদাচিত।
করিবা আনক দয়া সকরুণ চিত্ত।
হইবা শান্ত চিত্ত সর্ব্ব ধর্ম্মত বৎসল।
এহি ভাগবত ধর্ম জানা মহাবল।।"[২]

তিনি ভাগবতের এই বৃহৎ বোধটিকে অতি সহজ-সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন যা মানুষের অব্যক্ত অনুভবটিকে স্বতন্ত্রচিত্তে চিরদিনের জন্য বলিষ্ঠ এবং স্বাবলম্বী করে তুলেছিল। যিনি মানুষের মধ্যে নতুন ছন্দ, তাল, স্পন্দনে নতুন জীবনের সঞ্চার করেছিলেন। মানুষের মনের এই অব্যক্ত অনুভূতির প্রকাশক হলেন গুরু শংকরদেব। এই শংকরপন্থীর অন্যতম ভক্ত ছিলেন সৈয়দ আব্দুল মালিক। তাই তিনি শংকদেবের মহাজীবনের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে রচনা করলেন কলিকালের ধন্য ভারতের 'ধন্য নর তনু ভাল'। উপন্যাসটিতে অসমিয়া জনজীবনের প্রসঙ্গার্থে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। তাছাড়া, একমাত্র শংকরদেবই তার রচনার কেন্দ্রবিন্দু। উপন্যাসটি পড়ে মনে হয় স্বয়ং লেখক শংকরদেবের পূর্বে অর্থাৎ অসম

গঠনের প্রাক-কাল থেকে পরবর্তী প্রত্যেকটি সময়ে সশরীরে উপস্থিত থেকে একেকটি ঘটনাকে চক্ষুলব্ধ করে চলছেন। তিনি গল্প বলছেন আমরা শুনছি । তাঁর সঙ্গী হল সময় আমরা তাঁর শ্রোতা। উপস্থাপন এতটাই মনোরম যে কাল্পনিক চরিত্রগুলিও একেবারে ঐতিহাসিক বর্ণনায় একাকার হয়ে ওঠেছে।

"ইয়াত জাকে জাকে পহুও থাকে বোলে। একেখন হাবিতে বাঘে-ভালুকে-পহুয়ে চরায়ে সকলোবোর থাকে। কারো ওচরত কোনোয়ে ডিঙি পাতি নিদিয়ে।"[৩] উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্র দেহিরামের মনে এই কথাটি তুলে ধরে লেখক কেবল মাত্র তাঁর রচনার গুণকে সমৃদ্ধ করেননি, পশুদের জীবন যাত্রার একটি ছবিও তুলে ধরেছেন। মানুষের মধ্যে সমাজে অন্যের চেয়ে নিজের বল-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়। একের স্বাধীনতার ওপর অন্যের স্বার্থজনিত অভিলাষের উদাহরণ কম নেই। এক্ষেত্রে চতুষ্পায়ী প্রাণীর জীবন আলাদা, ভিন্ন। দেহিরাম মিকি পর্বত থেকে সাঁচি গাছের শন নিয়ে আসে বারভুঞা রাজ্যের মাধব কন্দলির টোলের জন্য। তাঁর কথা থেকেই আমরা তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কন্দলির টোলে কেবল বামুন বাড়ির মানুষই পড়াশোনা করতে পারত। তাছাড়া, শিব পূজা, দেবী পূজার নামে ব্রাহ্মণদের প্রতি নদীয়াল, মাছুয়াদের মতো নিম্নশ্রেণির মানুষের বিশ্বাসও ছিল প্রচুর। চণ্ডাল কর্তৃক 'রাজা পুকুর' দূষিত হলে প্রায় সাতদিনব্যাপী মেঘদেবতার পূজা করলে সেই পুকুরে পুনরায় জল প্রতিষ্ঠা হয়। এধরণের অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ও সৈয়দ আব্দুল মালিকের লেখায় ফুটে ওঠেছে। যেমন ফাল্গুন মাসে বসন্তের প্রকোপে গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ায় সাধারণ গ্রামবাসীদের মনে দেব-দেবীর প্রতি রাগ-বিদ্বেষের ভাব উদয় হয় ফলে গ্রামে শীতলা দেবীর পূজা শুরু হয় ইত্যাদি। তাছাড়া, অসমের নানা ধরণের বনজ সম্পদ যেমন হরিতকি, আমলকী, ত্রিফলা, নাহর, শিমূল ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের বিবরণ পাওয়া যায়। মাঘ মাসের শেষের দিকে মিকি পর্বতে বনহস্তী দ্বারা অনেক ঘর নষ্ট হওয়ায় বামুন গাঁওয়ের বরপূজারী এবং কালীরাম দৈবজ্ঞের মতামত ছিল যে ওই অঞ্চলের মানুষ বহুদিন ধরে নিয়মানুযায়ী গণেশ পূজা না করায় দেবতা রুষ্ট হয়েছেন এবং এই উপদ্রবে তাঁদের জীবন তছনছ হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি মাছ-মরীয়া, যুগী গ্রামে ফাল্গুণ মাসে ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগের মহামারিতে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারায়। তাই তাদের বিশ্বাস নিয়মিতভাবে শীতলা দেবীর পূজা এই মহামারীকে সমূলে বিনষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। মাঘের শেষে তিনদিন প্রচুর বৃষ্টি হয় কিন্তু ফাল্গুণ এবং চৈত্র মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে মানুষ নিজের মনকে সন্তুষ্ট করেছিল। মানুষের জ্ঞানের পরিমান এতটাই কমে গিয়েছিল যে তারা প্রাকৃতিক নিয়মকেও অনিয়মের ফলাফল ভেবে ভয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। অথচ তাদের এই পূজা-পার্বণ, বলি-বিধানও তাদের জীবনকে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তৎকালীন সমাজ

ব্যবস্থায় পরমার্থ লাভের সাধনায় মানুষের অবস্থা যে কী পরিমানে শোচনীয় ছিল তার একটি উদাহরণ নিম্নে বিস্তারিত—

'মদং মাংসঞ্চ মুদ্রা মৎস্যঞ্চ মিথুনমেব
মদ্যপানেন মনুজো সিদ্ধিং লভ্যেত বৈ,
মদ্যপানরতা সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরা...'[৪]

অরাজকতার হর্ষধ্বনি রবে নৃত্যগীতের মধ্যে দিয়েই পুরোহিত ছিলেন একজন অজ্ঞ শাস্ত্রবিদ। 'তার অর্থও কিজানি বুজি পায়। কিবা ভুলকৈ মাতিলেও জানি শুনিহে ভুলকৈ মাতে, যাতে নিজর স্বার্থমতে কার্য সমাপন করিব পারে।'[৫]

উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডের দেহিরাম পর্ব, আইচেনা-হেলচের পর্ব, শিবরাম-দেহিরাম প্রসঙ্গ, বামুনগাঁওয়ের পুরণ বরপূজারীর কথা, সমাজে অন্ধবিশ্বাসের দুটি বিবরণ এবং পুরোহিত ও ভক্তের দুর্ভাগ্যতাড়িত ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ পুরোপুরি কাল্পনিক। কিন্তু তৎকালীন সমাজর একেকটি উদাহরণ। প্রত্যেকের লেখায় দুইধরণের ভাব থাকে— প্রথমটি হল, লেখকের লেখায় স্ব-অভিজ্ঞ কল্পনার পরিপুষ্ট রূপ, দ্বিতীয়টি হল পাঠকের রসজনিত কল্পনার আহরণ শক্তি। সৈয়দ আব্দুল মালিক তাঁর উপন্যাসের শুরু থেকেই শংকরদেবের জীবনীটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে পারতেন কিন্তু তিনি শংকদেবের পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রাক-শংকরী যুগের একটি মোটামুটি আভাস তুলে ধরলেন তাঁর বহু অভিজ্ঞতার কাল্পনিক সূত্রে। 'কারণ চেতনায় অন্য কারো জীবনের ছায়া যদি মুহূর্তের জন্যও পড়ে তবে সে বাইরের বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ছায়াটাকে বিশ্লেষণ করে দেখা।'[৬] — সৈয়দ আব্দুল মালিকের চেতনায় বাহিত হয়েছিলেন শংকরদেবের ছায়া, যিনি দিব্যজীবনের অক্ষয় পুরুষ। অনেক যুগ ধরে যখন মানুষ ধর্মেরই আড়ালে তার জাগতিক স্পৃহা, অভিলাষ, আসুরিক স্পর্শে সমাজে শুষ্কতার বীজ রোপণ করে সেইসময় শ্রীমন্ত শংকরদেবের তপস্যা, সংস্কৃতির সংস্কার অসমকে বৈকুণ্ঠধামে পরিণত করে। আদিমকাল থেকেই কামরূপ রাজ্য ছিল শাক্তদেবীর পীঠস্থান। এহেন অবস্থায় বিকৃত মহাজানদের ব্যভিচারী পূজা, পঞ্চমকারের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধির পথ থেকে মানুষের হৃদয়কে কেবলমাত্র একজন দেবতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ঘুরিয়ে আনা সহজ ছিল না। ভক্তি আন্দোলনের তরঙ্গায়িত বৈপ্লবিক সময়ে শংকরদেবের মুক্তিকামী মন ছিল দুর্লভ মহৎ দর্শনের ভিত্তিমূল। তেমন এক প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবনকে চেতনায় আত্মস্থ করার চেষ্টায় কল্পনার বহুগ্রাসী প্রতিভা থাকা বাঞ্ছনীয়। কৃষ্ণপ্রেমে যাঁর হৃদয়ে ফুটেছিল শতদল পদ্ম, সেই পদ্মের শীতল ছোঁয়া কেবল ঔপন্যাসিকের লেখাতেই নয় চিরদিন যেন ভারতের প্রত্যেক পাঠকের খণ্ড-খণ্ড যুক্তির ধারণায় মানুষের বেদনার্ত মনকে সংযুক্ত করতে পারে তার জন্য লেখক তৈরি করলেন শুভ্র, শুচি, মনোহরণ কল্পনার বিশাল বলয়কে। উপন্যাসটিতে মহেন্দ্র কন্দলির টোল পর্বটি ছিল অন্যতম। আলিপুখুরি, বরদোয়া, আলিটঙনি, করতিপার ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ ছাত্রের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ সন্তানদেরও শিক্ষা

দেওয়া হত। সেই টোলে শংকরদেবও শিক্ষাগ্রহণ করেন। অধ্যয়নরত শংকরদেব এই টোলেই স্বরবর্ণের ব্যবহার না করে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি বিষয়ক কবিতা 'করতল কমল কমল দল নয়ন/ ভব দব গহন-বন শয়ন...' রচনা করেন। তারপর অধ্যাপক মহেন্দ্র কন্দলি তাকে দেব উপাধি দেন ও শঙ্করদেবকে সেরা ছাত্রে পরিণত করেন।

একজন সাহিত্যিকের মূল আদর্শ বা নীতি হচ্ছে তার নিশ্চিত বক্তব্য। ঔপন্যাসিক সৈয়দ আব্দুল মালিক এদিক থেকে ছিলেন অনন্য। তিনি তাঁর লেখায় কেবল চিন্তাকে প্রশমিত করেননি, উপন্যাসের ধারাটিকে স্বরূপভাবে তুলে ধরার জন্য বাকধারাকে মধুময় স্রোতে বইতে দিয়ছেন। তা খেরসূতী এবং শ্রীমন্ত শংকরদেবের কথোপকথনে ভেসে ওঠে— 'কিবা গীত এটা গুণগুণাই করবার পরা আহি বার বছরীয়া চেঙেলীয়া লরা এটা ঘর সোমালহি। মুকুলি দুয়ার মজিয়াত এটা গছর ওপরত শান্তভাবে জ্বলি আছে সরিয়হর তেল শলিতারে জ্বলোয়া এটা চাকি। তার সোন বরণীয়া পোহরে কোঠাটোর ভিতরখন পোহরাই তুলিছে।'[৭]

উপন্যাসে প্রত্যেক ঘটনার একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে কেবল রচনার গর্ভ পুষ্ট হয় না, পরিপুষ্টি লাভ করে লেখকের আত্মচেষ্টাও। উপন্যাসের টুকরো-টুকরো ঘটনাগুলিই স্মৃতি রোমন্থনে সাহায্য করে। লেখকের আত্মিক সত্তা পাঠকের মনকে ভাবিয়ে তুলে। জীবন কিংবা সমাজ সংঘটিত এমন অজস্র টুকরো টুকরো ঘটনা বৃহৎ ঘটনার যোগসূত্র। আমাদের সমাজ সংস্কারক শংকরদেবের বৌদ্ধিক সত্তা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। সেই বৌদ্ধিক বা জ্ঞানলব্ধ বিবৃতির উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন সাহিত্যের রসবোধ। যা মনে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে।

বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনে 'কৃষ্ণ' আনন্দে রসসাগর। এই রসসাগরের রাসস্বরূপা দামিনী রাধিকা। সৌন্দর্যের এই পথরেখাকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন সুগভীর মহিমার সত্য নিবেদন। উপন্যাসের শেষে সৈয়দ আব্দুল মালিকের মনে সেই প্রশান্তির চিহ্নটিই দীপ্ত, যা কাব্যিক বিন্যাসের শিল্পসম্মত রূপে প্রতিষ্ঠিত—

'এই কোমল বতাহজাকর বুকুত, করবাত মোর বুকুর মাজর তপত মৃদু
নিশ্বাসকণ মিলি গৈছে।...

ইমান মিঠা আন্ধার!

ইমান শান্তি, ইমান গভীর শান্তি। ইমান নীলা কৃষ্ণ...'

বহু শতাব্দী পর জন্মগ্রহণ করে লেখক ঘটনার যূপকাষ্ঠে নিজস্ব চেতনাকে যেভাবে উৎসর্গ করলেন তাতে লেখকের মৌলবোধকে ঐতিহাসিক বিচারে সত্য ও সার্থক বলতে

দ্বিধা হয় না। বাস্তব, প্রত্যাশার সঙ্গে কল্প-মানস সঞ্জাত ভাবোল্লাসের পরিণত কল্পিকালের আলোক সন্ধানী গ্রন্থ 'ধন্য নর তনু ভাল'।

মহেন্দ্র কন্দলীর টোল শিক্ষালাভের জন্য ছিল উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশ। নীল আকাশ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সবুজ অরণ্য, আনন্দ-মুখর কোলাহল, সুখে-দুখে জীবনের সহজ-জটিল, গভীর সুন্দর পরিবেশ। এমন এক পরিবেশে দেবভাষার অধ্যয়ণ-অধ্যাপনা করতে হয়েছিল ছাত্র-শিক্ষককে। বাধ্য, মনোযোগী, স্বাধীনমনা সাত বছরের পিতৃ-মাতৃহারা বিখ্যাত বারভূঞা পরিবারের কুসুমবর ভূঞার সন্তান শংকরকে জ্ঞানী পণ্ডিতরূপে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওঝা মাধব কন্দলি। সেই টোলকে কেন্দ্র করে একটি ছবি ফুটে ওঠেছে—

'পিছে, পরোয়া কথা একেবারেই। প্রথমে অং অঃ বোর শিকিব লাগে। পিছে মোর আকৌ মুরর ভিতরর দুয়ারবোর মুকুলি, এপিনে সোমাই আং বাংবোর ওলাই যায়... এদিন ইয়ার কন্দলি ওজার টোলত পঢ়া বারভূঞার ঘরর ডেকাগিরী শঙ্করক পাই বোলো, তোমালোক বর মানুহর ঘরর লরাই রজা-মহারজা, দেবতা, ঋষি মুনির মাত-কথা শিকিছা; পাছে আমার নিচিনা হালোয়া, হজুয়া ইতর মানুহর কারণে আমি বুজিব পরা মাত কথারে কিবা দেখিলেহে আমার কামত আহিব। তুমিয়ে দেখোন আমার মাত কথা সকলো জানা। তুমিয়ে লেখাচোন, আমিবোরে নিজর কথারে শাস্ত্রর কথা দুআষার শিকো।'

'শংকরে পিছে কি কলে ?'

'মই বোলো মোক খংহে করিব। কিবা দেবতার মাত কথা লৈ পেংলাই করিছো বুলি। পিছে তেঁও ভাবি চিন্তি কলে, 'তাই ভালেই কৈছ বলাই। কথাটো ময়ো ভাবি চাইছো। আমার মানুহর মুখত মাত কথা থকা পুঁথি-পাঁজি নাই দেখিহে, আমি আগর দিনর মাত-কথারে লেখা পুঁথি-পত্র পঢ়িবলগীয়া হৈছে। ঈশ্বরে সকলোরে মুখর মাত কথা বুজি পায়। আমিহে নেপাওঁ।'[৮]

প্রথমেই বলেছিলাম সৈয়দ আব্দুল মালিক তাঁর লেখায় সময়কে সঙ্গী করেছিলেন। তাই মধ্যযুগের পটভূমিকায় শংকরদেবের বক্তব্যকে তিনি প্রামাণিক ও ইতিহাসসম্মত না করে প্রশস্তিমূলক প্রতিকৃতিতে অংকণ করেছেন। সাহিত্যে 'অভিব্যক্তিবাদ' নামক একটি প্রসঙ্গ আছে। ইংরাজিতে যাকে বলে Expressionism। জার্মাণ নাট্য আন্দোলনের শিল্পচেতনায় একটি নতুন প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। যেখানে মনের উপলব্ধি বা অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা পরিমিত ও বক্তব্যের সুক্ষ্মতায় সৃজনশীল আবেগকে গ্রহণ করেছিলেন। চিত্রকলা ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিবাদের নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের দুই চিত্রশিল্পী Grunewald এবং El Greco-র আবেগপূর্ণ শিল্পচেতনায়। কিন্তু কেবল আবেগের

সঞ্চারিত ভাবনায় সাহিত্যের দেহে লাবণ্য দেখা যায় না। এরজন্য প্রয়োজন সামাজিক, রাজনৈতিক-নৈতিক, ধার্মিক মূল্যায়ণে নান্দনিক শিল্পকলার। ভাবনাটি উনিশ শতকের শেষার্ধে কলাকৈবল্যবাদ প্রসঙ্গে। আলোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় যে কয়েকটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে অন্যতম 'অখণ্ড সৌন্দর্যলোকে পৌছানোই শিল্পের কাজ।' অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবধারার পরিবর্তে শুদ্ধবাদী শিল্পভাবনার মূল হচ্ছে 'The religion of beauty' মানে কলাকৈবল্যবাদ (Art For Art Sake)। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবনাকে উপেক্ষা করা চলে না। আবার বাস্তবাদের দোহাই দিয়ে জাগতিক নানা তথ্যকে শিল্পের প্রাণবন্ত ভাবাটাও পুরোপুরি সত্য নয়। তাই প্রাথমিকভাবে বাস্তবতা বা বস্তুজগতের সীমাকে অতিক্রম করার জন্য আবশ্যক মনোরঞ্জণের নীলাঞ্জন ভাবনালোক। মরমি চেতনার অভিব্যক্তিতে প্রেম, প্রজ্ঞা, ভক্তিতে রহস্য এবং পরমসত্যের উন্মোচন করাই সাহিত্যের মূল আদর্শ। বাস্তবতার মিশ্রণে, ইন্দ্রিয় নির্ভর অনুভূতির অনুধ্যানে ভাবনার অসীম ব্যঞ্জনায় 'আধ্যাত্মলোক, সেই সাহসিক ভাবজগতের রহস্য উন্মোচন যাঁরা করেন' তাঁরাই হলেন মরমিয়াবাদী সাহিত্যিক।

সৈয়দ আব্দুল মালিকের শিল্প লেখনীতে সেই মরমি সত্তাটিকে ফুটে উঠতে দেখি। তাই তো তিনি শংকরদেবের আধ্যাত্ম ভাবনার উন্মোচন করলেন তারই নিজস্ব সংলাপে—

'মই মানুহ হৈ ভগবানর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হৈ জ্ঞান-বুদ্ধির-অনুভব-উপলব্ধির অধিকারী হৈ নিঃস্বার্থভাবে সামান্য কিবা এটাও করিব নোয়ারোনে?'[৯] ধর্মের প্রতি শংকরদেবের আত্মসমর্পণকে তিনি কেবল পুঁথিগত সম্পত্তি হিসেবে মেনে নেননি, জীবনের সম্পদ বলে মেনে নিয়েছিলেন। 'যত মানুহর পরিচয়ে পরিচয়, ভকতর পরিচয়েই পরিচয়— সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।'[১০] সাহিত্যে বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদের সংজ্ঞা, ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়। তবে মানববাদের প্রসঙ্গটি তা বহু আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আত্মার অস্তিত্বে মানুষের হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা, সর্বমানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। শংকদেবের মন-প্রাণে নতুন আনন্দের প্রেরণাত্মক জীবন সেই মহত্তম পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা— 'জীবন-জনজীবনর এই মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবর কারণেই মই এই বিশাল, মহান, ভারতত মানুহ হৈ জন্মধারণ করিছো। মই আহিছো অভিশপ্ত কলিকালক ধন্য করিবর কারণে।'[১১]

প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছুর যথাযথ রূপায়ণ এবং তার সঙ্গে থাকল শিল্পের শিল্পাত্মক ভাগবত-বিশ্বাস এবং আন্তরিক সহজ চেতনায় ঈশ্বর তাঁর সঙ্গী। নিছক যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে 'Nature Mystic' ধারণাটিকেও এই উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

সাধক শংকর উত্তর ভারতের একজন মহান বিপ্লবী সুফী সাধক কবীরের মৃত্যুর পর তার বাড়িতে গিয়ে কবীরের জীবন থেকে ভক্তির অসীম প্রেরণার রস আপন হৃদয়ে

ধারণ করেছিলেন। সেই ঈশ্বর সাধনার অম্লান ভাষ্যটি আজও অসমের মণিকূট-গর্ভে নিহিত হয়ে রয়েছে—

'কুকুর শৃগাল গর্দভরো আত্মারাম
জানিয়া সবাকো করিবা প্রণাম।'

মনে পড়ে যায় স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথা— 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। মধ্যযুগের এমন মহান আদর্শ থেকেই আমরা পেয়েছি আধুনিক সহানুভূতি। সৌন্দর্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার, বিচারের সঙ্গে বিশ্লেষণ, বুদ্ধির সঙ্গে বিবেক এবং প্রেমভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের এমন মিলনই ভারতীয় দর্শনকে পৃথিবীর অন্যান্য দর্শন থেকে পৃথক করে রাখে। বৈষ্ণব দর্শনের ছায়া ও কায়া হলেন কৃষ্ণ ও রাধা। দেহাত্মবোধ ছেড়ে এখানে আধ্যাত্মবোধই মুখ্য। প্রেম ও মনস্তত্ত্বের তীব্র ভাবানুরাগই শ্রেষ্ঠ। শংকরদেবকে আমরা গুরু হিসেবে পাই, সমাজ-সংস্কারক হিসেবেও পাই কিন্তু এতটুকুতেই কী তিনি সমাপ্ত! না, তিনি তিনি একজন ভাবুক মানুষ। জামাতা হরির মৃত্যুতে তিনি নিজেকে হাজার প্রশ্ন করলেন— 'মোর কারণেই অকালত প্রাণ দিবলগীয়া হল নেকি জোয়াই হরিয়ে? হরিয়তো কোনো অপরাধ করা নাছিল, কোনো রজাঘরীয়া আদেশ-নির্দেশনা অবমাননা উলংঘা করা নাছিল।'[১২] বিচারহীন বধ্যভূমিতে হরির শিরোচ্ছেদ ও মৃত্যু তাঁর মনে আঘাত দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বৈষ্ণব তিনি, ঈশ্বরের পথপ্রদর্শক নেতা। তাঁর ওপর রয়েছে সাংসারিক সমস্ত প্রাণী-জীবের দায়িত্ব-কর্তব্য। তাই তাঁর জীবনের প্রিয় ব্যক্তিগত আত্মীয়-মানুষের মৃত্যুও তাঁর পথকে অধোনমিত করতে পারেনি। 'কিন্তু মই ধৈর্য ধরিব লাগিব। মই শোকত ম্রিয়মাণ হৈ ভাগি পরিলে, নিষ্ঠুর রাজশক্তির অভিপ্রায়হে পূরণ করা হব। পরিয়ালটোক দুঃখ দিবর কারণেই মাধবক জীয়াই থাকিবলৈ দি হরিক বধ করিলে। আমি শোক-বেজারত অস্থির অধৈর্য হলে হত্যাকারীহঁতর দানবী উদ্দেশ্যহে পূর্ণ করা হব।'[১৩] এহেন আত্মসচেতন স্বভাব তাঁর সংগ্রামের পথটিকে প্রশস্ত করেছে। শোকের সময়ে ধৈর্য রেখে সংগ্রামকে বলিষ্ঠ করে তোলা। তাঁর এই সংগ্রামবোধই সমগ্র অসমে একদিন 'শংখ বাজি উঠিল; খোল-তাল-ডরা-বরকাঁহ বাজি উঠিল। মুহূর্তর কারণে ঠাইখনর বিষণ্ণতা যেন বহুত কমিল।'[১৪] এই শংকরদেবের আত্মিক সমবেদনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সাধক সৈয়দ আব্দুল মালিকের কল্পনা তরীই ছিল যথেষ্ট।

উপন্যাসটির চরিত্র বিশ্লেষণে মহেন্দ্র কন্দলির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, শিক্ষক, পণ্ডিত, ওঝা। তাঁর টোলে ব্রাহ্মণ ছাত্রের সঙ্গে কায়স্থ ছাত্রেরও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আলিপুখুরি, বরদোয়া, করতিপার ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে কলং, কপিলী থেকে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের যাতায়াত ছিল এই টোলে। বেদ-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গে হিন্দু দর্শন, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে পাঠদান করা হত। বিখ্যাত বারভূঞা পরিবারের কুসুমবর ভূঞার সন্তান

শঙ্করের শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মহেন্দ্র কন্দলি। 'মোর ছাত্রবোরর মাজত এটাকো যদি মই জনা সকলো বিদ্যা, সকলো শাস্ত্রর জ্ঞান দি পণ্ডিত করি তুলিব পারো, সেয়ে মোর জীবনর চরম সার্থকতা হব।'[১৪] ওঝা মহেন্দ্র কন্দলির স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত টোলটি ছিল ভবিষ্যতের পবিত্র সাধনা। তিনি তাঁর টোলে শিক্ষার্থীর জন্য ছাত্রাবাসেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি শংকরদবকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। মাত্র বারো বৎসর বয়সের শংকরদেবের বিচিত্র চিন্তাধারার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। ব্যাকরণ, অলংকার, কাব্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। মহেন্দ্র কন্দলির টোলে অধ্যয়ণরত শংকরদেব রচনা করলেন হরিশচন্দ্র উপাখ্যান, রুক্মিণীহরণ ইত্যাদি। সংস্কৃত ও অসমিয়া ভাষার একজন দক্ষ পণ্ডিতরূপে তাঁর দক্ষতা সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন একজন সরল, নম্র, বিনয়ী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ বারভূঞার সন্তানকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি ভূঞাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পেয়ে যোগ্যতম শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর এই সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চতর সম্মান প্রতিষ্ঠায় মহেন্দ্র কন্দলির ভূমিকাটি ঔপন্যাসিক অতি সযত্নে তুলে ধরেছেন। মহেন্দ্র কন্দলি উপন্যাসটির এক জায়গায় বলেছেন— "শঙ্করদেবর সম্পর্কে এতিয়া আপোনালোকর সন্দেহ, দুশ্চিন্তা দূর হ'লনে? আমার ডেকাগিরী এজন কবি হব, এজন গায়ক হব, এজন চিত্রকর হব, এজন নটুয়া হবা— আরু এজন পরম বৈষ্ণব হব, ভক্ত হব।"[১৬] শংকরদেবের নববৈষ্ণব যাত্রাপথে শিক্ষক মহেন্দ্র কন্দলির শিক্ষা তাঁর গুনগত চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছিল। শংকরদেব কোনো নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। চেয়েছিলেন সমাজের সমন্বয়াত্মক গঠন-পদ্ধতি। কীর্তনঘোষা তারই একটি উৎকৃষ্ট চিন্তা ও বলিষ্ঠ রূপের পরিচয়।

ঔপন্যাসিক শংকরদেবের চরিত্রটিকে আরও দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁরই শিষ্য মাধবদেবের চরিত্রটিকে উপন্যাসে সংযোজন করেছেন। তিনি ছিলেন পরম ভক্ত, কবি, শিল্পী, গায়ক, পণ্ডিত। তিনিও রচনা করলেন নানাধরণের বরগীত, গীত-নাট, নামকীর্তন। তিনি শংকরদেবের পরামর্শে সমস্ত শাস্ত্রের আধারে নামঘোষা রচনা করেছিলেন। নববৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শংকরদেবের অনুগামী মাধবদেব অসমিয়া সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণ প্রতিষ্ঠাপক। শংকরদেব আপন চেষ্টায় যে গভীর জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান করেছিলেন তারই একজন যোগ্যতম শিষ্যরূপে তিনি পেলেন শ্রী শ্রী মাধবদেবকে। মাধবদেব তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নামঘোষার মাধ্যমে একশরণ নামধর্মের চেতনায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমন্বয়াত্মক বার্তাকে সমাজে প্রচলন করেছিলেন। হরির নাম সকলের ক্ষেত্রেই এক এবং অনন্য। কেবল একশ্রেণি ব্রাহ্মণের মতপোষণ এই চিরসত্য কথাটিকে নাকচ করতে পারে না। তারই বিরোধে মাধবদেব নামঘোষায় ঘোষণা লিখলেন—

"মহাতাপী অন্ত্যজাতি তরয় কলিত সুখে
মুখে করি হরির কীর্ত্তন"

মাধবদেবের সুমধুর রচনা, ভাষা-ছন্দ সুর ইত্যাদি ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের উন্মত্ততা সৃষ্টি করে। কেবল মাধবদেবই নন, নারায়ণ ঠাকুর, গোবিন্দ গরমালি, বুঢ়া রাম আতা, বুঢ়া গোপাল আতা, বলরাম চান্দসাই প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হরিদেব, দামোদর দেব প্রভৃতি ব্যক্তিরাও বৈষ্ণবপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। শংকরদেবের সঙ্গে সঙ্গে মাধবদেবের রচিত গীতনাট্য অসমীয়া সংস্কৃতির পরিচয় বাহক। 'শংকরী' বৈষ্ণব সাধনাকে সমর্থন করেছিলেন রাজা নরনারায়ণের ভাই যুবরাজ চিলারায়। যিনি শংকরদেবের নাতিনী ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করেছিলেন। শংকরদেবের এই অনন্ত জয়যাত্রার প্রতি নরনারায়ণ রাজার মতবিরোধ-বিদ্রোহ দেখা যায়। একাংশ ব্রাহ্মণ শ্রেণির মতে শংকরদেবের এই বৈষ্ণবীয় প্রচার ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের অপব্যাখ্যা। ধর্মের এই সমন্বয়সূচক একশরণবাদকে তাঁরা সহ্য করতে পারেননি ফলে তারা নরনারায়ণের কাছে নানা অভিযোগ উত্থাপন শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন কোচ রাজবংশের রাজা এবং সেই রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য বিস্তারের ভার ছিল বীর চিলারায়ের ওপর। শংকরদেবের ভাতৃ রামরায়ের কন্যা ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করে চিলারায় বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। অন্যদিকে শংকরদেবের নতুন মতবাদ কোচ রাজ্যের প্রজার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করায় নরনারায়ণ ক্ষুব্ধ ও বিব্রত হয়ে পড়েন। প্রজা বলতে একাংশ ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষ এবং সমাজের সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষ। প্রজাদের মধ্যে এমন অনৈক্যবোধ সমাজের ক্ষতি বলে মনে করেছিলেন রাজা। এইকারণে তিনি রাজসভায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন শংকরদেবকে। পাটবাউসীর ধর্মপ্রচারে এহেন রাজ-আবাহন শংকরদেবের মহিমা প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে নরনারায়ণের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সেইসভায় শংকদেবের কাছ থেকে নরনারায়ণ শুনেছিলেন গোপীকৃষ্ণের কথা, বৃন্দাবনের কথা, বৈকুণ্ঠের কথা, নানা বৈষ্ণব আদর্শ। শংকরদেবের মানসপটে চিরজীবন যে কৃষ্ণের ছবি ছিল তাকেই তিনি মর্ত্যবাসীর চোখে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। উপন্যাসটির একজায়গায় আমরা দেখি যে, বৃন্দাবন বর্ণনা শুনে নরনারায়নের মনে বৃন্দাবন দর্শনেরঢ ইচ্ছা জেগেছিল। শংকরদেব তাঁতীকুছির নিপুণ, পারদর্শী শিল্পীদের সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য, ফুল, লতা-পাতা, জীব-জন্তুর মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের অসাধারণ কলাকৌশল ফুটিয়ে তুলেন। কাহিনির বর্ণনানুসারেই কৃষ্ণজন্ম কথা, শিশুলীলা, কালীয়দমন, শংখচূড় বধ, জোগীদের সঙ্গে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি নানা বৈচিত্রময় কার্যকলাপ তাঁর নির্মিত বস্ত্রশিল্পে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সুতোর এমন নিপুণ কারুকার্যময় বস্ত্রটিকে আনা হয় পাটবাউসীতে। এক নতুন অভিনব বিস্ময় সমাজে এক বর্ণময় গাঁথাকে প্রতিষ্ঠিত করে। শংকরদেবের এই শিল্প প্রতিভায় নরনারায়ণ রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পাটবাউসীর বারভূঞারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজার এমন কার্যকলাপ শংকর বিরোধী ব্রাহ্মণের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করলেও তাতে শংকরদেবের শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা বিন্দুমাত্রও স্খলন হয়নি। শংকরদেবের সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতি এমন শ্রমসাধক জীবনধনামূলক কার্যপ্রণালী মাধবদেবের মনে তাঁর প্রতি নিবেদন ও সমর্পণের গভীর ভাবকে জাগিয়ে তুলে—

"তোমার ভকতি অমিয়া ত্যাজিয়া
বিষয় গরল খাইলো
কত তপসাই নর তনু পাই
গোয়াইলো বিষয় ভোলে
যেন চিন্তামণি অমূল্য রতনি
বিকাইলো কাঞ্চন মোলে..." [১৭]

মহাত্মা কবীরের প্রসঙ্গ উপন্যাসটিকে আরও সুন্দর করে তুলে। কবীরের নাতিনী কাছ থেকে শংকরদেব কবীর সম্পর্কে নানা লৌকিক-অলৌকিক বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিলেন। হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি মুসলমান ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন। তাঁতীর জীবনবৃত্তি গ্রহণ করে তিনি রচনা করেছিলেন জাত-পাত মুক্ত মানব সমাজ হেতু নানা ধরনণের গীত। ফলে হিন্দুর জন্য তিনি ছিলেন সন্ত-সাধক, মুসলিমদের জন্য তিনি ছিলেন সুফী। মৃত্যুর পরে যখন তাঁকে মুসলিম নিয়মে কবর দেওয়া হয়, সেই কবর খোদাই করে দেখা গেল কবীরের মরণদেহ সুগন্ধি চন্দন কাঠে পরিণত হয়েছে। এমন এক পবিত্র স্থানকে শংকরদেব তীর্থক্ষেত্র বলেই গণ্য করেছিলেন। গঙ্গার পারে সেই কবীরের সমাধিক্ষেত্রে নমন করে শংকরদেব তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হয়েছিলেন। মানুষের সুন্দর একটি মনের জন্য জগত সুন্দর হয়ে ওঠে। ভক্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সকলকে একত্র করে রাখা তারই আদর্শতম উদাহরণ ছিলন কবীর। সমাজে যিনি কোনোদিন বিশেষ কোনো জাতি-ধর্মকে প্রশয় দেননি। তাঁর এই মহান উদ্দেশ্যই ছিল শংকরদেবের অন্যতম ধর্ম সম্ভার। মানুষের এমন আধ্যাত্মিক উত্তরণ সমাজে এক অসীম হৃদয়সম্ভ্রান্ত সম্ভাবনাকে জন্ম দেয়। ভারতের বুকে এক নতুন উন্মেষ পর্ব শুরু হয়। সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। কবীর কেবল মাত্র সনাতন সত্যকেই ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছিলেনা। উপনিষদের গূঢ়তত্ত্বকে তিনি হিন্দি ভাষায় রচনা করেছিলে। গাইলেন সাম্য ও ভাতৃত্বের নতুন গাঁথা। শক্তিশালী এবং স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করলেন রাম ও রহিমের একাত্ম ভাবনাকে। মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে অনন্ত ব্রহ্ম কিংবা আল্লার সাধনা করার জন্য প্রচার করে গেলেন—

"লোগ এইচা বাওরে, পহন পুজন যাই
ঘরকে চকীয়া কাহে না পূজে
জেহিকা পিসা খায়" [১৮]

শংকরদেব যে সত্যের সন্ধান করার জন্য তীর্থস্থান দর্শনে বেরিয়েছিলেন তা কবীরের সান্নিধ্যে অর্ধেকটাই যেন পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি হিন্দু সাধক রামানন্দ এবং মুসলমান সুফী সাধক শেখ টাকীর কাছে ধর্মতত্ত্বের যে শিক্ষা নিয়েছিলেন তারই পরিপূর্ণ রূপ হলেন কবীর। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য কবীরের কাছে ছিল এরূপ—

"হরি উত্তরত থাকে
আরু আল্লার ঘর পশ্চিমত
(তাত নিবিচারি) তোমার অন্তরর মাজত হরিক বিচারা
রাম আরু রহমান দুয়ো তাতেই থাকে" [১৯]

উপন্যাসটিতে প্রধান চরিত্র ছাড়াও কল্প চরিত্রগুলিও উল্লেখনীয়। বারভূঞা এবং কন্দলির টোলে দেহিরাম চরিত্রটির ভূমিকা রয়েছে। মধ্যযুগে লেখার জন্য প্রয়োজন ছিল সাঁচি গাছের বাকল। টোলের ছাত্রদের লেখার সুবিধার জন্য তা যোগাড় করতেন দেহিরাম। তার কাছ থেকেই প্রথম অধ্যায়ে বারভূঞা এবং কন্দলির টোলের প্রসঙ্গ দেখা যায়। আবার শিবরাম চরিত্রটিকে পাই এই অধ্যায়ে। যিনি লেখার কালি তৈরি করার পদ্ধতি দেহিরামকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এভাবে—

"শিলিখা, কেঁহরাজ, কুচিয়ার তেজ আরু গরুর মূত বা কেঁচুর রস একেলগ করি মাটির চরুর গাইদি নিগরাই যিখিনি কলা পানী উলিয়াব, সেইয়াই কালি বা মহী বা চিয়াঁহী। রনিগরাই লৈ সিতাবোর পেলাই দিয়া হয়। কলা-মিহলি রসখিনি কাপোরেরে চেকি ভূরুকাত বা বাঁহর পবীয়া চুঙাত ভরাই থোয়া হয়। সেইয়ে মহী-চুঙা।" [২০]

তাছাড়া, মদ-মাংসে লিপ্ত হয়ে থাকা একাংশ ব্রাহ্মণ ধর্মের নামে যে ব্যভিচার শুরু করেছিল তার বর্ণনায় বরওজা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। যিনি আবার সংস্কৃতশাস্ত্রও ভালো জানেন। উপন্যাসটিতে এই চরিত্রের আগমন শংকরদেবের জন্মপূর্বের একটি সামাজিক দিককে তুলে ধরেছে।

উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক তাঁর মানসপটে অসমের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। যেখানে নানা জাতির সংমিশ্রণে অসম রাজ্যের গঠন হতে দেখি। আহোম রাজার আগমন এবং মুসলিমদের আক্রমন অসমকেও নানা ভাবে প্রভাবিত করে। ফলে যেমন দেখা দিয়েছিল সংগ্রামিত বিধ্বস্ত জনসমাজ ঠিক তারই সংমিশ্রণে গড়ে ওঠেছিল আর্য, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৈরামী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর অসমের প্রদেশ। উপন্যাসটির তৃতীয় খণ্ডে অংকিত অন্যতম প্রকৃত চরিত্র হিসেবে শংকরদেবের কন্যা মনুর জামাতা হরির মৃত্যু এক বিশেষ আবহের সৃষ্টি করে। মেছাগড়ের রাজদোষে কারাবন্দী ছিলেন মাধবদেবের সঙ্গে মনুর স্বামী হরি। রাজা মাধবদেবকে হত্যা না করে শিরোচ্ছেদ করলেন জামাতা হরির। শংকরদেব তাঁর দ্বিতীয় পুত্র কমললোচনকেও এইভাবেই হারিয়েছিলেন। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের এমন নিরীহ বিচারে শংকরদেব কিন্তু মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েননি বরং জামাতার এই আত্মত্যাগ হয়ে ওঠেছিল তাঁর আত্মশক্তির উৎস। শ্রীমন্ত শংকরদেবের অপরাধ ছিল তিনি বরগীত বা কীর্তনঘোষা রচনা করেছিলেন সহজ-সরল ভাষায়। যাকে পড়তে প্রয়োজন হবে

না কোনো ব্রাহ্মণের, উচ্চ, ধনী, সম্পত্তিবান, ঐশ্বর্যশালী মানুষের। সকলের মুখের ভাষায় ফুটে উঠবে মনের পরিচয়। তাই শংকরদেব বলেছিলেন—

"দেহার অবশিষ্ট শক্তি একেঠাই করি মই আগবাড়ি যাম, মোর অনুগত ভকতসকলক লগত লৈ, হরিনাম বুকুত লৈ, চকুত স্বপ্ন লৈ, মাটি আরু আকাশর উদার আশীর্বাদ লৈ, কৃষ্ণর রূপ আরু গৌরব মনত রাখি। হে কৃষ্ণ..."[২১]

৬. উপসংহার:

ঈশ্বরপ্রেম ছাড়া মানবপ্রীতি সম্ভব নয়। তাই এই উদারপন্থী চেতনার মূল সম্বল ছিল কৃষ্ণরতি। তাঁদের এই ভক্তিপ্রাণের ডাকে সাড়া দিয়েছিল সমাজের নিঃসহায় শ্রেণি। যাদের সমাজে কোনো পদে বা মনুষ্যরূপে গণ্য করা হত না। তথাকথিত ধর্মীয় শাসনে এবং বলবান সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে নিম্নশ্রেণির অন্ত্যজ মানুষদের অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া হত। সেই অস্পৃশ্যদের পরম পাওনায় কৃষ্ণভক্তি হয়ে ওঠল দেবতার বরদান। কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত সমগ্র দেশ মেতে ওঠেছিল, শুরু হয়েছিল ধর্মীয় আন্দোলনে নতুন বৈষ্ণব দর্শন। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রেয়েরে দেবতা।' এই আদর্শ আজও অটুট ও স্মরণীয়। সার্বজনীন আদর্শে অনুগত বাংলা কিংবা অসমিয়া নবজাগরণ ছিল প্রেমের স্বরূপ। মানবতা বিকাশের চরম সময়। এর লক্ষ এবং আহ্বান রীতিমতো বৈপ্লবিক হয়ে ওঠেছিল। জাত্যাভিমানের কুটিল চিন্তা চূর্ণ হয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনে রক্ষণশীল ব্যাপারটিকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। নানা দ্বিমত, বাদ-প্রতিবাদের আকাশে আজও যে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবর্ণের সম-অধিকারের প্রথা দেখা যায় তার মূলে রয়েছেন ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নায়ক শ্রীমন্ত শংকরদেব। তাঁদের উদ্বুদ্ধ প্রাণশিক্ষা সমাজের সবধরণের মানুষের জন্য নতুন দিককে উন্মোচন করে গেছে। ঢোল, করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা সহযোগে কৃষ্ণভক্তির নৃত্যগীত আজও সমাজে বহুধা মিশ্রণের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। শ্রীমন্ত শংকরদেবের সাম্যবাদী মতাদর্শ শংকরাচার্যের সূত্রভাষ্য খণ্ডিত করেন এইরূপ—

"কুকুর শৃগাল গর্দভরো আত্মা রাম
জানিয়া সবাকো পরা করিবা প্রণাম" [২২]

অন্যদিকে, শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়" [২৩]

ভারতবর্ষে এই প্রথমবারের জন্য সাম্যবাদী দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। অবিনশ্বর আত্মার অনির্বাণ জ্যোতির দ্বারা ঐকান্তিক সাধনায় তাঁরা বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা

প্রত্যেক মানুষকে রূপ-রসে, আনন্দের সামগ্রিক সত্তায় ভারতের অমূল্য রতনরূপে মানুষের হৃদয়ে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তারই চেষ্টায় উজ্জীবিত প্রাণপুরুষ শংকরদেবকে নিয়ে রচিত সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'ধন্য নর তনু ভাল' অসম তথা অসমিয়া সাহিত্যজগতের কীর্তিমান নিদর্শন।

তথ্যসূত্র:

১| বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ড০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৭৬
২| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৩৯৪
৩| তদেব, পৃষ্ঠা ১২
৪| তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩
৫| তদেব, পৃষ্ঠা ৫৪
৬| নির্বাস, অমিয়ভূষণ মজুমদার, পৃষ্ঠা ১
৭| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৫৯
৮| তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮
৯| তদেব, পৃষ্ঠা ২০২
১০| তদেব, পৃষ্ঠা ২০৪
১১| তদেব, পৃষ্ঠা ২১৪
১২| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৩৭২
১৩| তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৩
১৪|তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৫
১৫| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৬৬
১৬| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ১৩৫
১৭| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৪৩৩
১৮| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৪২৪
১৯| ধন্য নর তনু ভাল, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃষ্ঠা ৪২৫
২০| তদেব, পৃষ্ঠা ২৯
২১| তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৪
২২| তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩১
২৩| শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পৃষ্ঠা ১২৭

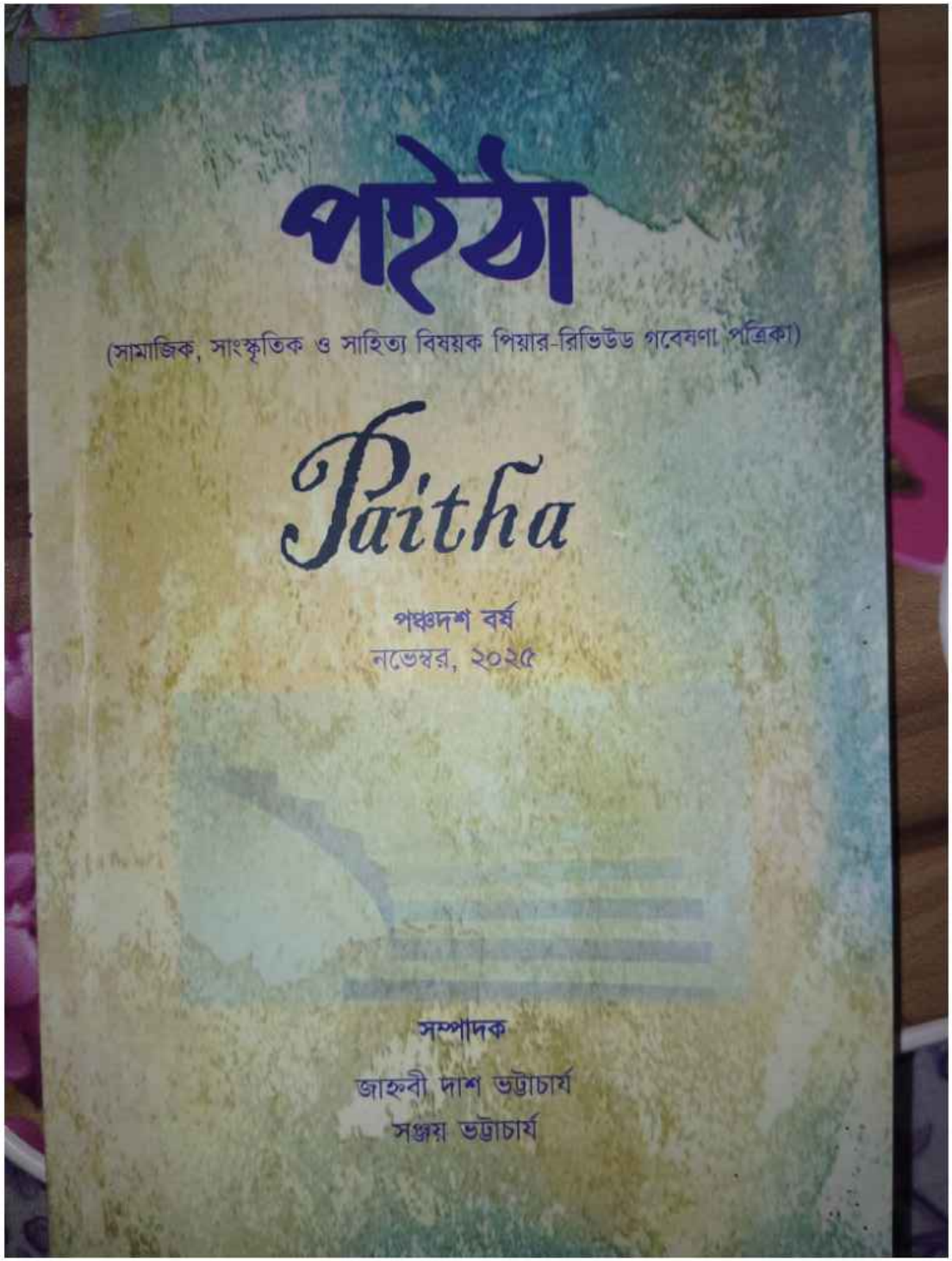
পইঠা
(সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা)
Paitha
পঞ্চদশ বর্ষ
নভেম্বর, ২০২৫
সম্পাদক
জাহ্নবী দাশ ভট্টাচার্য
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ISSN No. 2277-8942

(বাংলা-অসমিয়া বিশেষ দ্বিভাষিক সংখ্যা)

পইঠা

(সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা)

Paitha

(A Socio-Cultural and Literary Peer-Reviewed Research Journal)

পঞ্চদশ বর্ষ
নভেম্বর, ২০২৫

সম্পাদক

জাহ্নবী দাশ ভট্টাচার্য
সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সত্যজিতের 'গোরস্থানে সাবধান' গোয়েন্দাকাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুরোনো কোলকাতাকে আবিষ্কার
রাহুল দে ১১৩

সন্তোষকুমার ঘোষের 'স্বয়ং নায়ক' উপন্যাসে প্রতিফলিত চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকের নিবিড় পাঠ
অশোককুমার রায়, দীপঙ্কর সাহা ১২৬

অসমিয়া বিভাগ

দৈনন্দিন জীৱন যাপনত আচার্য চাণক্যৰ প্রভাৱ
ড. ধীৰেন ডেকা ১৩৭

অসমৰ চুতীয়া সকলৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য
ৰীচা চুতীয়া ১৪৭

সন্তোষ কুমাৰ কর্মকাৰৰ 'শিপাৰ সন্ধানত' উপন্যাসত প্রতিফলিত পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ সংকট
বন্দিতা শইকীয়া ১৫৬

ই-আলোচনীত প্রকাশিত অসমীয়া হাস্য-ব্যংগ সাহিত্য: এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
ঋতুপর্ণা শইকীয়া ১৬২

ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পত নিম্নশ্রেণিৰ জীৱন-সংগ্রাম
ৰেশ্মী বীৰ ১৬৭

ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পত নিম্নশ্রেণিৰ জীৱন-সংগ্ৰাম

বেশ্মী বীৰ

গৱেষক, বাংলা বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, অসম

Abstract

Jhumur Pandey, a distinguished short story writer from Assam's Barak Valley, who emerged in the literary scene during the 1980s, occupies a unique position in Bengali literature. She was born in 1962 in Hailakandi district. Her childhood and adolescence were spent in the tea-garden areas, where the everyday struggles, sufferings, festivals, and life experiences of the tea laborers deeply influenced her mental formation and literary perspective.

Primarily a short story writer, Jhumur Pandey's numerous short stories published in various newspapers and journals across the Barak Valley, Northeast India, and West Bengal-have received widespread appreciation from readers and critics alike. In terms of linguistic style, she has developed a distinctive voice. Her stories are characterized by simplicity yet intensity, realism yet enriched with literary beauty.

The lives of poor people in the tea-garden regions—their joys and sorrows, hopes and aspirations, festivals, cultural practices, superstitions, and struggles for education-form the central themes of her writing. She strives to bring the marginalized and neglected sections of society into the mainstream of literature. Her exceptional ability lies in her subtle understanding of the psychology of the working class and her artistic portrayal of it through literature.

From a research perspective, Jhumur Pandey's literature serves as a social document. Her stories explore themes such as capitalist oppression, economic inequality, the dual exploitation of women, and the lack of education and awareness. These aspects are significant from the viewpoints of sociology, feminist studies, and Marxist theory.

Jhumur Pandey is not merely a successful storyteller; she is the voice of the tea laborer community and rural life, born of deep personal experience. The essence of her literature lies in the reflection of reality, critique of exploitation, and the call for social awakening. Thus, Jhumur Pandey has rightfully earned recognition as a research-worthy representative of social realism in modern Bengali short fiction.

Keywords: *Laborers, Indigenous people, Exploitation, Education, Society.*

১. ভূমিকা :

ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহত বৰাক উপত্যকাৰ চাবাগানীয়া জনজাতিৰ দুঃখ-কষ্ট, দৰিদ্ৰতা আৰু শোষণ স্পষ্টভাবে প্ৰতিফলিত হৈছে। সমাজত থকা কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ ভয়ংকৰ

প্রভাৱ মানুহৰ জীৱন আৰু নৈতিকতাক গভীৰভাৱে আঘাত হানিছে। বিশেষকৈ নাৰীৰ যাতনা আৰু নিপীড়ন তেওঁৰ লেখনীত এক তীব্ৰ বাস্তৱতাৰে প্ৰকাশ পাইছে। শ্ৰমজীৱী সমাজৰ বিদ্ৰোহী মানসিকতা, অধিকাৰ-চেতনা আৰু মুক্তিৰ আকাঙ্ক্ষা একেদৰে প্ৰতিফলিত হোৱাৰ লগতে অভ্যন্তৰীণ দ্বন্দ্ব আৰু আত্মসন্দেহই এই গোটৰ অগ্ৰগতিত ব্যাঘাত সৃষ্টিৰ দিশো উজ্জ্বল কৰিছে। শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু সামাজিক পিছপৰা অৱস্থাই যুক্তিবাদী চেতনা বিকাশৰ পথক অৱৰোধ কৰিছে। তথাপিও মুক্তিৰ কল্পলোক প্ৰতীকী ৰূপ তেওঁৰ গল্পত উদ্ভাসিত হৈ উঠে। নাৰীবাদী আৰু সামাজিক মনো-বৈজ্ঞানিক পাঠেৰে এই লেখাসমূহ বাংলা সাহিত্যত এক স্বকীয় মূল্য সংযোজন কৰিছে। সামগ্ৰিকভাৱে ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহ সমাজ-সাংস্কৃতিক পৰিস্থিতিৰ এক সত্যান্বেষী দলিল হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে।

২. গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য :

এই গৱেষণাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ৰৰাক উপত্যকাৰ সমাজ-বাস্তৱতাৰ বৈচিত্ৰ্যক ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহৰ সাহিত্যিক মাধ্যমেৰে আত্মস্থ কৰি তাত নিহিত সমাজবিজ্ঞানী, নাৰীবাদী, ৰাজনৈতিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক দিশবোৰ উন্মোচন কৰা। ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহ চাহ-বাগানীয়া জনগোষ্ঠীৰ জীৱনসংগ্ৰাম, নিম্নবৰ্গীয় মানসিকতা, দাৰিদ্ৰ্যপীড়িত পৰিসৰ, কুসংস্কাৰ আৰু সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বৰ সজীৱ প্ৰতিচ্ছবি। সেইদৰে এই গৱেষণাই প্ৰথমতে গল্পসমূহৰ বিষয়বস্তুত নিহিত বাস্তৱজীৱনৰ আখ্যানসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি সমাজৰ শোষণমূলক গঠন আৰু আধিপত্যৰ সংকটক চিহ্নিত কৰিব।

দ্বিতীয়তে, এই গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য হ'ল ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ ব্যঞ্জনাস্বৰূপ গল্পৰ বিশ্লেষণ কৰি তেওঁৰ সাহিত্যিক অৱদানক মূল্যায়ন কৰা। সমাজৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ কল্পিত কাহিনী নহয়, ৰৰং বাস্তৱজীৱনৰ ৰক্তমাংসৰ ছবি কিমান নিপুণতাৰে গল্পত প্ৰতিফলিত হৈছে, তাক স্পষ্ট কৰা এই গৱেষণাৰ লক্ষ্য।

তৃতীয়তে, নাৰীৰ অভিজ্ঞতা, শ্ৰমিকজনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰচেতনা আৰু সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ৰ প্ৰশ্নসমূহক নাৰীবাদী আৰু সাবঅল্টাৰ্ণ অধ্যয়নশাস্ত্ৰৰ দৃষ্টিৰেখাত প্ৰবিষ্ট কৰা এই গৱেষণাৰ মুখ্য দিশ। ইয়াৰ মাধ্যমেৰে চাহ-বাগানীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়, মৰ্যাদা আৰু সমাজত সন্মিলনৰ প্ৰচেষ্টাক উদঘাটন কৰা ইয়াৰ উদ্দেশ্য।

চতুৰ্থতে, এই গৱেষণাই ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ সাহিত্যৰাজিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বাস্তৱচেতনাৰ মাধ্যমেৰে বাংলা চুটি-গল্প সাহিত্যৰ বিকাশযাত্ৰাত নতুন ধাৰাৰ দিশ উন্মোচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।

৩. গৱেষণা পদ্ধতি :

এই গৱেষণাত গুণগত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, য'ত পাঠ-সমালোচনা, পাঠ-বিশ্লেষণ আৰু সাহিত্য-পাঠৰ মাধ্যমেৰে ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহৰ জৰিয়তে সমাজ-সাংস্কৃতিৰ প্ৰসঙ্গক উন্মোচন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।

তদুপৰি, তত্ত্বভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিত মাৰ্ক্সবাদ, নাৰীবাদ, সাবঅল্টাৰ্ণ স্টাডিজৰ আলোচনাক মূল উপায় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

৪. গৱেষণাৰ পৰিসৰ :

এই গবেষণাৰ পৰিসৰ মূলত ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ নিৰ্বাচিত গল্পসমূহলৈ সীমিত, যাত বৰাক উপত্যকাৰ চাবাগানীয়া জীৱন, দৰিদ্ৰ সমাজৰ অস্তিত্বসংকট, কুসংস্কাৰ-অন্ধবিশ্বাস, নাৰীবাদী চেতনা আৰু শ্ৰেণি-সংঘাতক আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ধৰা হৈছে। ইয়াৰ সীমা সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী আৰু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণত সীমাবদ্ধ থাকিলেও, সমকালীন বাংলা ছোটগল্পৰ গতি-প্ৰকৃতি বুজিবলৈ এই গবেষণা সহায়ক হ'ব।

৫. পূৰ্বকৃত অধ্যয়নৰ সমীক্ষা :

যিকোনো গবেষণাৰ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় অংগ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে— গবেষকজনে নিজৰ গবেষণাৰ বিষয় সম্পৰ্কে আগতে কৰা কামসমূহৰ সমীক্ষা কৰিব লাগে।

ঝুমুৰ পাণ্ডে বিষয়ে এতিয়ালৈকে অতি বিস্তৃত গবেষণা হোৱা নাথাকিলেও, বাংলা ছোটগল্পৰ সামগ্ৰিক ধাৰা, বৰাক উপত্যকাৰ সাহিত্য, চাবাগানীয়া সমাজৰ জীবনকেন্দ্ৰিক সাহিত্য আৰু সাবঅল্টাৰ্ণ সমাজৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰবন্ধ আৰু গবেষণা প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ উপৰিও বাংলা ছোটগল্পৰ ইতিহাস আৰু বিকাশ, বৰাক উপত্যকাৰ সাহিত্যচৰ্চা, আৰু চাবাগানীয়া সমাজৰ সাহিত্যিক প্ৰতিফলন সংক্ৰান্ত গ্ৰন্থসমূহত ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ সাহিত্যভিত্তিক আংশিক আলোচনা দেখা যায়।

তথাপিও, বিশেষকৈ ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহক কেন্দ্ৰ কৰি গভীৰ সমাজ-তাত্ত্বিক, নাৰীবাদী মাৰ্ক্সবাদী পাঠৰ ভিত্তিত গবেষণা হোৱা নাই। সেয়েছে, এই গবেষণাই পূৰ্বৰ সাহিত্য-সমালোচনাৰ অভাৱ পূৰণ কৰি তেওঁৰ সাহিত্যক সমাজবিজ্ঞানী আৰু সাংস্কৃতিক গবেষণাৰ পৰিসৰত বিশেষ স্থান দিব বুলি আশাবাদী।

৬. মূল বিষয়বস্তুৰ আলোচনা :

ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ 'ডাইনি' গল্পটো মানুহৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ সৈতে জড়িত। সমাজ তথা মানুহৰ বিচিত্ৰ ৰূপ ইয়াত ফুটাই তোলা হৈছে। আৰ্থিক সম্পৰ্কৰ সৈতে জাতি-প্ৰথাও অঙ্গাঙ্গিভাৱে জড়িত। বৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ বিস্তৃত ৰূপেই হৈছে জাতি-প্ৰথা। এই জাতি-প্ৰথাত সামাজিক বৈষম্য সংঘাত আৰু বিদ্ৰোহৰ জন্ম দিয়ে। এই সংঘাত বা বিদ্ৰোহ কেৱল শক্তি বা আৰ্থিক সমতাত সীমাবদ্ধ নাথাকে; প্ৰান্তবাসী মানুহৰ মাজতো ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ দেখা যায়। বৃত্ত বা বৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰে দুৰ্বল, স্বাধীনচেতা মানুহৰ ওপৰত গোষ্ঠীগত বেষাবেষি দেখা যায়। 'ডাইনি' গল্পৰ দুখীয়া চৰিত্ৰই এই গোষ্ঠীগত সংঘাতৰ দ্বাৰাই বলি হয়। গল্পটি গ্ৰাম্য কুসংস্কাৰৰ ৰূপ যেনে ফুটাই তোলা হৈছে, তেনে একাংশ নিম্নবৰ্গীয় মানুহৰ চিন্তাধাৰা, তেওঁলোকৰ কৌশল, ছল-কপটো প্ৰকাশ পাইছে।

সমাজ আৰু সমাজব্যৱস্থাত চেতনা এটা অপ্ৰতিৰোধ্য বিষয়। সংগ্ৰাম আৰু অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি চেতনা বিকাশ লাভ কৰে। দুৰ্বল, অক্ষম মানুহ এই স্পৰ্দ্ধাৰ ওচৰত হাৰ মানে। দুখীয়া দুৰ্বল নাছিল, কিন্তু শ্যামপুৰ গাঁওখনৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিঃস্বাৰ্থ মৰমেই তেওঁৰ জীৱনৰ অকালপতনৰ কাৰণ হৈ উঠে। দুখীয়া আছিল ধাই। তেওঁৰ আছিল আঠ বিঘা জমি, যাত ভাগত চাষ কৰিছিল পচা বাউৰী। ঘৰখনৰ উঠোনত লাউ, ঝিঙা, বেগুন ফলিছিল। দুখীয়াৰ ঘৰেও দুখীয়াক স্নেহ কৰা হৈছিল, দুখীয়াৰ পিতাই তাক ৰৰ ভাল পাইছিল। তেওঁলোকৰ পাঁচ-ছটা শিশুৰ জন্মৰ পিছতেই মৰিৰ অবস্থাত দুখীয়া বাচি উঠিছিল। সেয়েহে

পিতাই তেওঁৰ নাম ৰাখিলে দুখীয়া। তেওঁ কৈছিল— "হামাৰ দুখীয়াৰ হামি কোন দুখ হতে নাই দিবো।"[১]

পিতাই ঘুৰি ঘুৰি দুখীয়াৰ কাৰণে এজন ঘৰজোৱাই আনিছিল। কিন্তু দুখীয়াৰ স্বামী আছিল অলস আৰু অভিমানী, ফলত শ্বশুৰেকৰ লগত তেওঁৰ বনিবনা নহ'ল। সি ঘৰ এৰি পলাই গ'ল। তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰৰ জন্ম হ'ল। দুখীয়াৰ পিতা-মাতাই বহুত চেষ্টা কৰিছিল তাইক দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ দিবলৈ, কিন্তু দুখীয়া সাজু নহ'ল। দুখীয়াই কৈছিল— "এইতো হামি বেশ আছি। তৰি— তৰকাৰী ফলাই, ধাই কাম কৰি। কত কত প্ৰাণ হামাৰ হাতেই দুনিয়াৰ আলো দেখে। ক্ষেতে ধান আছে, ছেলেটাও বড়ো লক্ষী, স্কলে পড়ে। চিন্তা কিসেৰ হামাৰ।"[২]

কিন্তু সেই লক্ষী পুতেকটোৱে চহৰলৈ গৈ আৰু উভতি নাহিল। দুখীয়াই বাট চাই জীৱন কটাই দিলে। পুতেকেও বাপেকৰ স্বভাৱ পাইছিল। দুখীয়াৰ স্বামীৰ গান-বাজনাৰ শখ আছিল; সেই সুবাদে সি কোনো কীৰ্তনৰ দলে ঢোল বজাইছিল। এই কথাবোৰ জানি দুখীয়াৰ শান্তিপূৰ্ণ জীৱনত ভদ্ৰাৰ আগমনে তাইৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য সলনি কৰি দিলে। ভদ্ৰাই তাক তাবিজ-কবজ আৰু মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰ শিকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিলে।

দুখীয়াৰ এই শিক্ষাৰ ফলত মাস্টাৰবাবুৰ স্ত্ৰীৰ কোলজোৱা এটা ফুটফুটীয়া পুত্ৰৰ জন্ম হ'ল। পিছত দুখীয়াই ভালদৰে বুজি পালে, সেই পুত্ৰৰ জন্ম এনেই হ'বলগিয়া আছিল, তেওঁৰ মাদুলি বা মন্ত্ৰৰ জোৰে নহয়। তেতিয়া ভদ্ৰাই তাক ক'লে, মন্ত্ৰৰ জোৰ পাবলৈ একেবাৰে উলংগ হৈ হাতে তেলৰ বাটি লৈ শণমাড়িৰ পাহাৰত গৈ তাৰা মাতৃৰ পূজা দিব লাগিব। সেই মন্দিৰত পূজা দিয়াৰ পিছৰ পৰা গাঁওবাসীৰ মুখত নানা কথা ঘুৰি ঘুৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে— "কেউ বলে, দুখীয়াকে নদীৰ ধাৰে চুল খুলে নাচতে দেখেছে" আকৌ "কেউ বলে— "শ্মশানে ৰাতেৰ বেলা নাংটো হয়ে ঘুৰে থাকতে দেখেছে।"[৩]

যতীৰ পুত্ৰৰ ৰক্ত-আমাশয়ত মৃত্যু দুখীয়াৰ জীৱনৰ এক দিশপালটোৱা পৰ্ব হিচাপে প্ৰতিফলিত হয়। এই ঘটনাই গাঁওবাসীৰ চিন্তন-পদ্ধতিত এক নাটকীয় পৰিৱৰ্তন আনে। দুখীয়াক 'ডাইনি' হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াই মূলতে গাঁওবাসীৰ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ আৰু ভীতি-মনোবৃত্তিৰ এক সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্ৰতিফলন বুজাই দিয়ে। গাঁওখনত মায়ে-যুৱতীয়ে নিজৰ সন্তানক দুখীয়াৰ ছাঁয়াৰ পৰা বচাবলৈ ধৰিলে; তেওঁক এৰাই চলিল। এই গণমত-গঠন প্ৰক্ৰিয়াত কেৱল শ্যামৰতী আৰু পচাইয়ে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে যে দুখীয়া সত্যই ডাইনিত ৰূপান্তৰিত হৈছে। সেয়া প্ৰমাণ কৰে যে, সমাজৰ ভিতৰত অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধেও কিছু যুক্তিবাদী বোধ জীয়াই থাকে। তথাপিও সংখ্যাগুৰত্বৰ সামাজিক বলয়ত দুখীয়াৰ অস্তিত্ব শোষিত আৰু নিঃশেষিত হয়।

গাঁওবাসীৰ এই আচৰণৰ ফলত দুখীয়া গভীৰ অনুতাপত দগ্ধ হয়। গাঁওখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ অগাধ মৰম, উদাৰতা আৰু নিঃস্বাৰ্থ দান— যি দুখীয়াক সামাজিক সম্প্ৰদায়ৰ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কৰি তুলিছিল। শেষত তেওঁৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰে। তেওঁ নিজৰ বাগানৰ লাউ, ঝিঙা, বেগুন গৃহে-গৃহে বিতৰণ কৰিছিল; জন্মলগীয়া বহু শিশুক নিজৰ হাতত পৃথিবীৰ পোহৰ দেখুৱাইছিল। তথাপিও অন্ধবিশ্বাসৰ বলয়ত গাঁওবাসীয়ে তেওঁৰ ওপৰত গণ-হিংসা চলায়। তেওঁক জীৱিত অবস্থাত কেচিন ঢালি জ্বলাই হত্যা কৰা সমাজ-মনস্তত্ত্বই প্ৰতিফলিত কৰে কুসংস্কাৰ কিমান ভয়ংকৰ ৰূপত সমাজৰ নৈতিকতাৰ মূলে আঘাত হানিব পাৰে।

শ্যামবতীৰ প্ৰতিবাদ আৰু পচাইৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাও দুখীয়াক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফলত দুখীয়াৰ জ্বলা মাংসৰ গন্ধ সমগ্ৰ শ্যামপুৰ গাঁৱত যেন এক শাশ্বত সামাজিক কলঙ্ক ৰূপে বিয়পি পৰে।

গল্পৰ অন্তত দুখীয়াৰ শিক্ষিত পুত্ৰজনে গাঁওলৈ উভতি আহি মাকক নাপায়। মাকৰ অনুপস্থিতি আৰু গাঁওখনত বিয়পি থকা দুখীয়াৰ মৃত্যুৰ স্মৃতি তেওঁৰ জীৱনক বিষাদময় কৰি তোলে। সেও মাকৰ দৰে এটা অতিপ্ৰাকৃত স্বপ্নেৰে বিচাৰ কৰে—সাদা ঘোৰাত চেপি মাক-ছোৱালীয়ে সাদা মেঘ পাৰ হৈ এক নতুন সাদা পৃথিবীৰ সন্ধানত আগবাঢ়ি যায়। এই প্ৰতীকী স্বপ্নে দুখীয়াৰ নিপীড়িত, শোষিত জীৱনলৈ এখন মুক্তিৰ কল্পলোক প্ৰতিষ্ঠা কৰে।

ৰৰাক উপত্যকাৰ চাবাগানীয়া জনজাতিক লৈ ৰচিত অধিকাংশ সাহিত্যকৰ্মত নিম্নবৰ্গীয় সংস্কাৰ, আন্দোলন আৰু মানসিকতা প্ৰতিফলিত হয়। সাবঅল্টাৰ্ণ ষ্টাডিজ-ৰ আলোচনাত দেখা যায় যে শ্ৰমজীৱী মানুহৰ বিদ্ৰোহ, প্ৰতিবাদ আৰু অধিকাৰ-চেতনা সমাজ-বিশ্লেষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠে। তথাপিও ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ কিছুমান গল্পত এই গোটৰ ভেতৰতে থকা কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ কূট-উপস্থিতি প্ৰতিফলিত হৈছে। সিহঁতে উচ্চবৰ্গৰ বিৰুদ্ধে সচেতন, সক্ৰিয় আৰু স্বাধীনচেতা হলেও নিজৰ মাজৰ অভ্যন্তৰীণ দ্বন্দ্ব আৰু আত্ম-সন্দেহই তেওঁলোকক দুৰ্বল কৰি তোলে। গোষ্ঠীগত বৌদ্ধিক জাগৰণ একেদৰে অভিব্যক্তিৰ সম্ভাৱনা তৈয়াৰ কৰে, কিন্তু গোষ্ঠীগত সংঘাতে সমাজৰ সামাজিক পৰিকাঠামোক অৱৰুদ্ধ কৰি ৰাখে। শক্তিমানৰ আধিপত্য খণ্ডন কৰিবলৈ নোৱাৰি এই গোটৰ মানুহে বহুসময়ত নিজৰকেই আঘাত কৰে, আত্মবিনাশৰ পথ বাচি লয়।

ফলত, উচ্চবৰ্গৰ আধিপত্য আৰু শোষণৰ সমালোচনা কেৱল পৰ্যাপ্ত নহয়; নিম্নবৰ্গীয় চিন্তাধাৰাৰ বিকাশ আৰু যুক্তিবাদী চেতনাৰ বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্ৰাসঙ্গিক হৈ উঠে। কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ অন্তহীন সংঘাতে নিম্নবৰ্গীয় সমাজক আজিও সভ্যতাৰ মূল সোঁতালৈ সংযুক্ত হ'ব পৰা নাই। সাবঅল্টাৰ্ণ ষ্টাডিজ-ৰ আলোচনাই দেখুৱাইছে, নিম্নবৰ্গীয় আন্দোলন আৰু মানসিকতা দুয়োটা বিপৰীতমুখী-তেওঁলোকে স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰৰ দাবী তোলে, কিন্তু সেই অধিকাৰৰ প্ৰয়োগ-কৌশলত নিজেই সন্দিহান হৈ পৰে ।

অন্যফালে, উচ্চবৰ্গীয় সমাজতো অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ আছে, কিন্তু সম্মান আৰু অহংকাৰ সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত সিহঁতে বহু সময়ত এই ধৰণৰ বিশ্বাস প্ৰদৰ্শন কৰা বৰ্জন কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে, দাৰিদ্ৰ্যপীড়িত অন্ত্যজ সমাজ ভাষা, শিক্ষাৰ সীমাবদ্ধতা আৰু সামাজিক পিছপৰাৰ বাবে আজিও যুক্তিবাদী বোধত উপনীত হ'ব পৰা নাই। ফলত, সংবাদপত্ৰত "ডাইনি সন্দেহত" বহু নাৰীৰ গণ-হত্যাৰ বৰ্ণনা অহৰহ প্ৰকাশ পাই থাকে।

ঝুমুৰ পাণ্ডে দুখীয়াৰ মৃত্যু দৃশ্যত জনতাক ব্যংগ কৰি কয় যে, অত্যাচাৰী ৰাজনীতিক-শক্তিক উচ্ছেদ কৰিবলৈ বিপ্লৱ কৰাটো যদি গৌৰৱজনক হয়, তেন্তে দুখীয়াৰ দৰে নিৰীহ নাৰীক 'ডাইনি' আখ্যা দি জীয়াই জীয়াই জ্বলাই মাৰি উল্লাস কৰা একেবাৰে সভ্যতাহীন আচৰণ। ইয়াৰ দ্বাৰাই সূচিত হয় নিম্নবৰ্গীয় মানসিকতা। যেতিয়া কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ দমন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয় তেতিয়াই তেওঁলোক সভ্যতাৰ মূল ধাৰাৰ পৰা ছিটোৱাই পড়ে।

মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ : গল্পখনত উৎপাদন-ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আধাৰিত শোষণৰ ফলত নিম্নবৰ্গীয় দুখীয়া সমাজৰ নিপীড়ন, অমানবিকতা আৰু আত্মবিনাশৰ যন্ত্ৰণা স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে।

গণতান্ত্ৰিক বিচ্যুতি : সচেতন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আৰু সংবিধানিক ন্যায়ৰ অস্তিত্ব থকাৰ পিছতো গাঁওসমাজৰ হিংসা আৰু কুসংস্কাৰ-প্ৰেৰিত হত্যা গণতান্ত্ৰিক ন্যায়ব্যৱস্থাৰ এক ভয়ংকৰ বিচ্যুতি ৰূপে প্ৰকাশ পায়।

নাৰীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : দুখীয়া নামৰ নাৰীৰ ওপৰত সংঘটিত হিংসা প্ৰমাণ কৰে যে সমাজত নাৰীক সহজে বলি-ছাগলী ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হয়, য'ত লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য কুসংস্কাৰৰ মিলিত ৰূপ গঢ় লয়।

সামাজিক মনোবিজ্ঞান : গাঁৱৰ গোটীয়াল ভীৰু-মনস্তত্ব, ভীতি আৰু সন্দেহৰ মানসিক প্ৰবণতাই ব্যক্তিগত বিবেচনাক দমন কৰি এক সামাজিক উন্মাদনা সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত দুখীয়াৰ দগ্ধ-মৃত্যু সংঘটিত হয়।

ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ 'বিৱৰ্ণ দ্বিপ্ৰহৰ' গল্পটো আৰম্ভ হয় ৰমলী নামৰ এজনী মানসিকভাৱে বিকৃত নাৰীৰ পৰিচয়ৰে। কেতিয়াবা তাইও সমাজৰ অন্যসকলৰ দৰে স্বাভাৱিক জীৱন-যাপন কৰিছিল। তেওঁৰ পিতা সুভাষ আছিল এজন মাটিৰ শিলপী। মাতৃহীন ৰমলীজনী পিতৃৰ স্নেহৰ ছত্ৰ-ছায়াত ডাঙৰ হৈছিল। পিতৃ সুভাষ নিজৰ অনাহাৰকো উপেক্ষা কৰি কন্যাৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ৰমলীজনে স্বপন নামৰ এজন শ্ৰমজীৱী যুবকক ভাল পাইছিল। কিন্তু এটা দুৰ্ঘটনাত— ম্যানেজাৰৰ ঘৰখনত চাৰা গছত ঔষধ ছটিয়াই থাকোঁতে স্বপনে ভুলত সেই বিষাক্ত হাতেই পানী খায়, ফলত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাকো ম্যানেজাৰে আইনৰ জাল ফাঁকি দি গোপন কৰি পেলায়। একেদৰে, শিলঙৰ এটা ব্ৰিজত কাম কৰোঁতে পিতা সুভাষো দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হাৰায়।

এই একেলগীয়া দুজন প্ৰিয়জনৰ মৃত্যুৱে ৰমলীৰ জীৱনক স্তব্ধ কৰি পেলায়। মানসিক ধাক্কা সামৰি উঠিব নোৱাৰি ৰমলী অচিৰেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতাত পৰে। কমলা পিসিয়ে তেওঁৰ বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেনবাবুৰ পুত্ৰৰ সৈতে বিবাহৰ বাবে আৰ্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বপন আৰু পিতৃৰ মৃত্যুৰ গভীৰ আঘাতে ৰমলী মানসিকভাৱে ভাঙি পৰে আৰু অৱশেষত পাগলী ৰূপে গাঁৱে-গাঁৱে ঘুৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে।

গল্পটোৱে এক গভীৰ সমাজ-অৰ্থনৈতিক সত্য উন্মোচন কৰে। উচ্চবৰ্গীয় শাসন-প্ৰশাসন আৰু পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰ অধীনত সুভাষ আৰু স্বপনৰ দৰে দিনমজুৰৰ মৃত্যু কেতিয়াও চৰকাৰি নথিপত্ৰত অঙ্কিত নহয়। সিহঁতৰ জীৱনৰ বিনিময়ত কোম্পানীয়ে অতি সামান্য ক্ষতিপূৰণ এককালীন অৰ্থ প্ৰদানত পৰিয়ালক নীৰৱ কৰি পেলায়। সুভাষৰ মৃত্যুৰ পিছত কোম্পানীয়ে ৰমলীৰ হাতত কেৱল দুই হাজাৰ টকা আগবঢ়ায়, আৰু সেই টকাৰে তেওঁৰ বিবাহৰ আয়োজন কৰা হয়। এই সামাজিক-অৰ্থনৈতিক কৌশলে প্ৰমাণ কৰে যে নিম্নবৰ্গীয় আন্দোলন বা বিক্ষোভ পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাই টকাৰ বিনিময়ত দমন কৰি আহিছে— ই এক প্ৰাচীন আৰু পৰীক্ষিত নীতি।

ফলত, প্রাপ্য-অপ্রাপ্য, ৰাজনৈতিক চক্রান্তত জড়িত আৰু পুঁজিবাদী যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা বঞ্চিত নিম্নবৰ্গীয় সমাজে নিজৰ স্বতন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হেৰাই পেলায়। প্ৰজন্মান্তৰে দমন আৰু বঞ্চনাৰ শিকলত আবদ্ধ ৰমলীৰ দৰে লোকসকল মানসিকভাৱে চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। তেওঁলোকে দলনেতা আৰু শাসকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাব নোৱাৰে; তদ্বিপৰীত, শোষণৰ যন্ত্ৰতেই পৰিণত হয়। আধিপত্যবাদী ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই এই অক্ষমতাৰ সুযোগ লৈ শোষণক জিৱণি দিয়ে।

লেখকে স্পষ্টভাৱে কৈছে— "...একে বদলানো চাইবে, কিন্তু আশ্চৰ্য কি জানিস, কতো ক্ষমতা ৰাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যায়। কতো বক্তৃতা বাতাস ভাৰি কৰে। কতো আইন কাগজে বন্দি হয়। কিন্তু ৰমলীৰা তেমনি ৰাস্তায় ঘুৰে বেড়ায়..."[৬] এই উক্তি সাবঅল্টার্ণ জনজাতিৰ শোষণত আধিপত্যবাদী সমাজ-ৰাজনীতিৰ নিঃশব্দ সহায়িকাক স্পষ্ট কৰে। ৰমলীৰ দৰে নিপীড়িত নাৰীসকল মুক্তি বিচাৰে, কিন্তু কমলা পিসিৰ দৰে সমাজৰ মধ্যস্থতাকাৰী গোটে তেওঁলোকৰ বিদ্রোহী সত্তাক হিংস্ৰভাৱে দমন কৰি ৰাখে।।

এই কাহিনী প্ৰমাণ কৰে যে, বাংলা সমাজ-সাহিত্যত নিম্নবৰ্গীয় জীৱনৰ ছবি ভিন্ন আঙ্গিকত প্ৰতিফলিত হৈছে। পুঁজিবাদী সমাজৰ দমন-যন্ত্ৰৰ বিপৰীতে নিম্নবৰ্গৰ বিক্ষোভ শূন্যতালৈ গুচি যায়; কেতিয়াবা ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহত ৰূপান্তৰিত হয়, আকৌ কেতিয়াবা নিৰুৎসাহিত হৈ আত্ম-অস্বীকাৰত পৰিণত হয়। সাবঅল্টার্ণ অধ্যয়নে যি কথা কয়—শোষিতৰ মত নথিপত্ৰত অঙ্কিত নহয়, তেওঁলোকৰ কণ্ঠ সৰ্বদায় কোনো মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰভাৱশালী কণ্ঠই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে—ইয়াকেই এই গল্পত পাঠযোগ্যভাৱে ফুটাই তোলা হৈছে।

'বিৱৰ্ণ দ্বিপ্ৰহৰ' কেৱল এজনী পাগলীৰ বেদনাকাহিনী নহয়; ই আধিপত্যবাদী সমাজ-ৰাজনীতি, পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সাবঅল্টার্ণ সমাজচেতনাৰ এক সংহত প্ৰতিচ্ছবি। আধুনিক বাংলা ছুটিগল্পৰ ক্ষেত্ৰত ই এক বিশেষ দৃষ্টান্ত, য'ত নিম্নবৰ্গীয় জীৱন, শোষণ-দমন, বঞ্চনা, দাৰিদ্ৰ্য, প্ৰেম, ভণ্ডামি আৰু ৰাজনীতিৰ জটিল অন্তর্দ্ৰাহ সঙ্গতিপূৰ্ণভাৱে একে লগে মিলি গ'ল।

মাৰ্ক্সবাদী বিশ্লেষণ : গল্পখনত দৰিদ্ৰ-শ্ৰমজীৱী গোটৰ জীৱনসংগ্ৰাম, খেতি-বাটি আৰু জীৱিকাৰ সংকটৰ মাজত জন্ম লোৱা হতাশা আৰু অৰ্থনৈতিক বৈষম্যৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্টভাৱে দেখা যায়।

গণতান্ত্ৰিক বিচ্যুতি : গাঁও সমাজত সমতা আৰু অধিকাৰৰ মূল্যবোধ থাকিলেও ক্ষমতা-কেন্দ্ৰিকতা আৰু সামাজিক বৈষম্যে সাধৰণ লোকৰ ন্যায় আৰু সুৰক্ষা প্ৰদানে ব্যৰ্থ হৈ পৰে।

নাৰীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : গল্পৰ নাৰী-পাত্ৰই সংসাৰ, দাৰিদ্ৰ আৰু সমাজৰ দুৰ্বলতাৰ চাপত যি নিষ্ঠুৰ কষ্ট ভোগ কৰে, সেয়া নাৰীৰ দ্বৈত-শোষণৰ প্ৰমাণ ৰূপে প্ৰতিফলিত হয়।

সামাজিক মনোবিজ্ঞান : গল্পখনত দৰিদ্ৰ সমাজৰ মানসিক বিভ্ৰান্তি, ভাঙি পৰা আশা আৰু ক্লান্ত চেতনাই এক গুচি উঠা সামাজিক হতাশাৰ ৰূপ সৃষ্টিৰ দিশত আগবাঢ়ে।

'স্পন্দন' গল্পখন অমৰাপুৰ নামৰ কাল্পনিক গাঁওখনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচিত, য'ত ব্যক্তিগত সুখ-দুখৰ লগত সমাজ-সাংস্কৃতিক বাস্তৱতা মিলি এক জটিল অভিজ্ঞতা সৃষ্টি

কৰিছে। কাহিনীৰ মুখ্য চৰিত্ৰ বিকৰ্ণ আৰু মুন্নি— এজন কৃষক-প্ৰাৰ্থী আৰু তেওঁৰ পত্নী— এহে শুধু ব্যক্তিগত জীৱনৰ আখ্যান নহয়, সমগ্ৰ গাঁও-সমাজৰ প্ৰতিফলন। গল্পখনত পঞ্চায়েত নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক ভণ্ডামি, দালাল-প্ৰথা, ৰাজনৈতিক হিংসা, আৰু আইনৰ ভ্ৰমণত গাঁওৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যি ধৰণে ধ্বংস হৈছে, সেইটো অতি বাস্তৱধৰ্মীভাৱে প্ৰকাশ পাইছে।

অমৰাপুৰ গাঁওখনত নিৰ্বাচন এক সামাজিক উৎসৱৰ দৰে হাজিৰ হয়। কিন্তু সেই উৎসৱৰ তলত আছে ভয়, ষড়যন্ত্ৰ আৰু অৰ্থৰ অবিমৃষ্যকাৰী ব্যৱহাৰ। বিকৰ্ণ, এজন সাধাৰণ কৃষক, যাক গাঁওবাসীয়ে সততা আৰু দায়িত্ববোধৰ বাবেই প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰে। তেওঁৰ জমি বিক্ৰী কৰি নিৰ্বাচনৰ খৰচ যোগান ধৰা এই বিষয়টোৱেই স্পষ্ট কৰে যে গাঁও-সমাজকো গণতন্ত্ৰ পুঁজিবাদী প্ৰক্ৰিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে।

বিষণ নামৰ দালালটো চৰিত্ৰগতভাবে দ্বৈত। তেওঁ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ পাছতো 'গ্ৰামোন্নতি'ৰ ভাষণ দিয়ে। ই একেবাৰে আধুনিক গ্ৰাম্য ৰাজনীতিৰ প্ৰতিফলন, য'ত উন্নয়নৰ সপোনে সাধাৰণ জনতাক মোহিত কৰে, কিন্তু অন্তৰত থাকে ক্ষমতা-অধিগ্ৰহণৰ বাসনা।

মুন্নি আৰু বিকৰ্ণৰ সংসাৰ 'কবৰিটিলাৰ সূৰ্যোদয় আৰু ঘুঘুৰ ডাক' গাঁওজীৱনৰ স্বাভাৱিকতা আৰু নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক। মুন্নিৰ অতীতৰ দুখ, মাতৃ-পিতৃৰ অনুপস্থিতিৰ স্মৃতি— সেইবোৰ বিকৰ্ণৰ সৈতে দাম্পত্যৰ আঁচলত নতুন আশাত ফুটি উঠিছিল। এইবোৰ উপাদান সমাজত নাৰীৰ এক নৱ-প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰিচয়ক সূচায়। কিন্তু সেই সুখৰ সংসাৰ ৰাজনৈতিক হিংসাৰ বলি হৈ পৰে। বিকৰ্ণৰ হত্যাকাণ্ড আৰু মুন্নিৰ ধৰ্ষণ—ই কেৱল ব্যক্তিগত শোক নহয়; ই গাঁও সমাজৰ নৈতিক পতনৰ এক গভীৰ দৰ্শন।

মুন্নিৰ ওপৰত হোৱা ধৰ্ষণ এক বহুমাত্ৰিক সঙ্কেত বহন কৰে। প্ৰথমতে, ই নাৰীৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক হিংসাৰ প্ৰক্ষেপ। দ্বিতীয়তে, ই গাঁও সমাজত নাৰীৰ দেহৰ ওপৰত পুৰুষ-শক্তিৰ নিয়ন্ত্ৰণক প্ৰতিফলিত কৰে। তৃতীয়তে, গৰ্ভবতী অৱস্থাত ধৰ্ষণ— ই সামাজিক নিষ্ঠুৰতাৰ চূড়ান্ত ৰূপ। ইয়াত নাৰীৰ অস্তিত্বক কেৱল দেহৰ পৰা বিচাৰি লোৱা হৈছে।

গল্পখনৰ শেষভাগত দাৰোগা আৰু বিষণৰ অৱতৰণ বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। দাৰোগাই যেতিয়া ন্যায়ৰ প্ৰতীক নহয়, বিপৰীত শোষকৰ ৰূপত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া সমাজত 'আইন' এক শূন্য শব্দ ৰূপে পৰিণত হয়। ইয়াত লেখকে আইনৰ ৰক্ষককেই ভক্ষকত পৰিণত কৰে— ই এক আধ্যাত্মিক-সামাজিক সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে।

'স্পন্দন' কেৱল এটা গাঁওকেন্দ্ৰিক কাহিনী নহয়; ই আধুনিক সমাজৰ গণতান্ত্ৰিক ভণ্ডামি, নাৰীৰ ওপৰত সংঘটিত সহিংসতাৰ নিষ্ঠুৰতা, আৰু ন্যায়-আইনৰ দেউলীয়া বাস্তৱতাৰ সমষ্টিগত প্ৰতিচ্ছবি। মুন্নিৰ প্ৰতিবাদ, দাৰোগাক আক্ৰমণ কৰা ইত্যাদি প্ৰতীক সূচায় যে নাৰী অপৰাধৰ প্ৰতি নিস্তব্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে। তেনে হিচাপে, স্পন্দন একেবাৰে সাহিত্যিক আখ্যানৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সমাজ-বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত দণ্ডায়মান ৰূপ লাভ কৰিছে। এই কাহিনী সমাজত ন্যায়, উন্নতি আৰু নৈতিকতাৰ নামত যি ভণ্ডামি চলি আছে, তাক উদ্ঘাটন কৰি আমাক সজাগত প্ৰদান কৰে।

মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ : 'স্পন্দন'-ত আবদ্ধ দৰিদ্ৰ-শ্ৰমজীৱী গোটৰ জীৱনৰ আনন্দ, শোষণ-দমন আৰু অৰ্থনৈতিক বৈষম্যৰ আঁৰত সামাজিক ক্ষয় দেখা পোৱা যায়, য'ত বৰ্গসংঘাত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হয়।

গণতান্ত্ৰিক বিচ্যুতি : গল্পখনত সমাজত ন্যায়, সমতা আৰু মানৱাধিকাৰৰ ধাৰণা থাকিলেও ক্ষমতা-প্ৰয়োগৰ অভাৱ আৰু সমাজ ভাঙনিৰ বাৰে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ হ্ৰাস পোৱা ইত্যাদি বিষয়বোৰ পৰিলক্ষিত হয়।

নাৰীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ইয়াত নাৰী-চৰিত্ৰই শোষণৰ বিপৰীতে নিজৰ অস্তিত্ব মূল্য বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, যদিও পুৰুষকেন্দ্ৰিক সামাজিক গঠনই তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ পথ কন্ধ কৰি ৰাখে।
সামাজিক মনোবিজ্ঞান : গল্পখনত নিম্নবৰ্গীয় মানুহৰ হতাশা, আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ ছন্দ আৰু জীৱনৰ স্পন্দনবোৰ মানসিক দ্বন্দ্ব আৰু বেদনা ৰূপে প্ৰকাশ পাইছে।

'ছিন্তাই' গল্পখনত সুদাম এজন শিক্ষিত আদিবাসী যুবক। তেওঁৰ শিক্ষাৰ বাবে পিতৃয়ে জমিন বিক্ৰী কৰে। এই পৰিৱেশত শিক্ষা মানে সমাজত উত্তৰণৰ এক আশা। কিন্তু শিক্ষিত হোৱাৰ পাছতো সুদামে কোনো চাকৰি লাভ নকৰে। ইয়াত লেখকে দেখুৱাইছে যে, আধুনিক শিক্ষাৰ কাঠামো আদিবাসী সমাজৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ নহয়। সমাজত শিক্ষা পুঁজিৰ লগত জড়িত, ফলত পুঁজিহীন দৰিদ্ৰ জনগোষ্ঠী শিক্ষা লাভ কৰিলেও সামাজিক শক্তিৰ দৃঢ় কণ্ঠ পোৱাত ব্যৰ্থ। শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য সমাজত ন্যায়, সুযোগ আৰু উন্নয়ন নিশ্চিত কৰা কিন্তু সুদামৰ অভিজ্ঞতাই সেই দিশৰ পৰিপূৰ্ণ ব্যৰ্থতা উন্মোচন কৰে।

ব্ৰসিতবাবু, যিজন মদৰ দোকানৰ মালিক, মূলতে পুঁজিবাদী সমাজৰ প্ৰতিনিধি। তেওঁ ধনশক্তিৰ জৰিয়তে সমাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। চিন্তাৰ ওপৰত কৰা নৃশংস অত্যাচাৰকো তেওঁ নিজৰ ধনৰ বলত আইনীভাবে এৰি যায়। ইয়াত পুঁজিবাদী শক্তিয়ে কেৱল অৰ্থনৈতিক সম্পদেই দখল নকৰে, ন্যায় ব্যৱস্থাকো বিকৃত কৰি তোলে। ফলত আদিবাসীসকলৰ জীৱন কেৱল শোষিত নহয়, তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰো কঢ়ি লোৱা হয়।

গল্পখনত প্ৰধান সমস্যা হৈছে আদিবাসীসকলৰ কণ্ঠহীনতা। চিন্তাৰ ওপৰত হোৱা বিভীষিকাময় অত্যাচাৰৰ পিছতো সমাজে নীৰৱ থাকে। ভয়ে, দাৰিদ্ৰই আৰু ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অভাৱেই তেওঁলোকক নিশ্চুপ কৰি তোলে। ইয়াত মাৰ্কছবাদী দৃষ্টিভংগীৰে বুজা যায় যে, শোষিত সমাজে নিজৰ অধিকাৰ সজাগভাবে উচাপি ল'ব নোৱাৰিলে শোষণৰ বৃত্তান্ত চলি থাকেই। চিন্তা, এজন আদিবাসী মহিলা, দুবাৰ শোষিত হয়— এবাৰ পুঁজিবাদী শক্তিৰ হাতেৰে, আৰু পুনৰ সামাজিক ন্যায়হীনতাৰ বাবে। এইখিনি লিংগভিত্তিক দমনকো গল্পটোত প্ৰকট হোৱা দেখা যায়। মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা সহিংসতা কেৱল ব্যক্তিগত নহয়, ই সামাজিক আৰু গঠনমূলক সমস্যাৰ ফল। এই দিশত গল্পখন নাৰীবাদী সমাজবিজ্ঞানৰো গৱেষণাৰ বিষয় হ'ব পাৰে।

সুদাম চৰিত্ৰটো শিক্ষাৰ সত্বেও তেওঁৰ দিশাহীনতা, চাকৰি নাপোৱা আৰু পুঁজিবাদীৰ আগত পৰাজয় মূলতে নিম্নবৰ্গ জীৱনৰ প্ৰতীক। ইয়াত শিক্ষিত আদিবাসী যুবকৰ অৱস্থা চিত্ৰিত হৈছে। শিক্ষা মানে ক্ষমতা নহয়; শিক্ষা পুঁজিৰ লগত সংযুক্ত হ'লে তেতিয়াহে সামাজিক মৰ্যাদা আনে। সুদামৰ ব্যৰ্থতাৰ দ্বাৰা লেখকে সমাজৰ এটা বৃহৎ অক্ষমতৰ প্ৰসংগ নাড়ি ধৰিছে।

মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ : শোষকবর্গ আৰু শোষিতবর্গৰ দ্বন্দ্ব ইয়াত মুখ্য। অসিতবাবু পুঁজিপতি, সুদাম আৰু চিন্তা শোষিত।

গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি : তেওঁলোকৰ স্বাভাৰিক অধিকাৰ—শিক্ষা, চিকিৎসা, ন্যায্য মজুৰি পদে পদে খণ্ডিত হৈছে আৰু কোনো গণতান্ত্রিক সুৰক্ষাই কার্যকৰ নহয়।

নাৰীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : চিন্তাৰ ওপৰত হোৱা সহিংসতা আৰু তাৰ ন্যায়হীনতা লিংগভিত্তিক বৈষম্যকো প্রতিফলিত কৰে।

সামাজিক মনোবিজ্ঞান : এই গল্পখন আদিবাসী সমাজৰ মূলধাৰাৰ পৰা বিচ্ছিন্নতা আৰু তেওঁলোকৰ কণ্ঠহীনতাৰ এক সাহিত্যিক দলিল।

অতএব, 'ছিন্তাই' কেৱল এটা ব্যক্তিগত কাহিনী নহয়। ই এটা গৱেষণাধর্মী দলিল, য'ত আদিবাসী সমাজৰ জীৱনসংকট, পুঁজিবাদী শক্তিৰ আধিপত্য, লিংগভিত্তিক শোষণ, আৰু শিক্ষাৰ ব্যর্থতাজনিত দিশবোৰ প্রতিফলিত হৈছে। সুদাম আৰু চিন্তাৰ জীৱনভাগ্য আদিবাসী সমাজৰ এক বৃহৎ সামাজিক প্রতীক। সাহিত্যত এনে প্রতিফলন সমাজবিজ্ঞানীয় অধ্যয়ন আৰু ন্যায়ৰ প্রয়োজনীয়তাক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে।

ঝুমুৰ পাণ্ডে'ৰ 'অধিকাৰ' গল্পখন অসমৰ চাহ-বাগানী শ্রমিক সমাজৰ ৰাজনৈতিক বাস্তৱতা আৰু অধিকাৰ হৰণৰ এক সজীৱ সাহিত্যিক দলিল। গল্পখনৰ মুখ্য চৰিত্র বীৰেন মাঝি, বহু বছৰ ধৰি চাহ-বাগানত কাম কৰা এজন শ্রমিক। তেওঁৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে লেখকে শোষণ, দমন, ৰাজনৈতিক প্রহসন আৰু অধিকাৰহীনতাৰ দৃশ্য উন্মোচন কৰিছে।

বীৰেন বিশ বছৰ ধৰি চাহ-বাগানত কর্মৰত। কাম কৰিবলৈ গৈ হোৱা দুর্ঘটনাৰ ফলত তেওঁৰ সোঁ ভৰি ক্ষম হৈ পৰে। এই শাৰীৰিক বিকলতা সত্ত্বেও তেওঁৰ জীৱন চাহ-বাগানী সমাজৰ গৰিবী আৰু অনিশ্চয়তাৰে আবদ্ধ। বাগানৰ ফাণ্ডত জমা হোৱা টকাই তেওঁৰ একমাত্র আশা-তেওঁ সেই টকাৰে নিজৰ ছোৱালীৰ বিবাহ দিব খোজে। কিন্তু এই টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পঞ্চায়েতৰ কৃপাত আশ্রিত হ'বলগীয়া অৱস্থাই দেখুৱাইছে যে, শ্রমিকসকলৰ পৰিশ্রমৰ বিনিময়তো তেওঁলোকে সঠিক অধিকাৰ নাপায়। ইয়াত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাৰ দমন আৰু দৰিদ্র শ্রেণীৰ ওপৰত চলি থকা আর্থিক অন্যায় স্পষ্ট হয়।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশত নাগৰিকৰ মূল অস্ত্র হৈছে ভোটাধিকাৰ। কিন্তু বীৰেনৰ অভিজ্ঞতা দেখুৱাইছে যে চাহ-বাগানী সমাজৰ এই মৌলিক অধিকাৰো লুট কৰা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনত স্থানীয় এম. এল. এ. সুধীৰবাবুৱে নিজৰ সমর্থকসকলৰ সহায়ত ভোটকেন্দ্র দখল কৰে আৰু জনগণৰ নামত তেওঁলোকে ভোট দিয়ে। প্রত্যেক ভোটাৰকে পাঁচ টকাৰ বিনিময়ত কিনিব চেষ্টা কৰা হয়। বীৰেনে এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদ কৰাৰ সাহস কৰে যদিও প্রতিবাদ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ভিৰুতা, দৰিদ্রতা আৰু ছোৱালিক সুৰক্ষিত ৰাখিব নোৱাৰাৰ ভয়। সমাজত নাৰীৰ ওপৰত থকা কুনজৰৰ ভয় তেওঁৰ নীৰৱতাৰ অন্যতম কাৰণ। ইয়াত সমাজবিজ্ঞানৰ গঠনমূলক হিংসাৰ ধাৰণা প্রযোজ্য হয়— য'ত প্রতিবাদ দমন কৰিবলৈ প্রত্যক্ষ প্রহাৰৰ প্রয়োজন নহয়, সামাজিক গঠনটোৱেই ব্যক্তিক নীৰৱ কৰি তোলে।

নীৰৱ সমাজৰ ভোগান্তিক সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰি তোলাত সক্ষম। বিশেষকৈ নাৰীৰ জীৱনচৰ্যাৰ ভিতৰত দমন, দুঃখ আৰু যাতনাৰ যি অন্তৰ্ভেদী চিত্ৰ, ই পাঠকক গভীৰভাবে স্পৰ্শ কৰে। ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ গল্পসমূহ কেৱল কাহিনী নহয়, ই হৈছে সমাজৰ নিষ্পেষিত অধ্যায়ৰ এক সাহিত্যিক দলিল। তেওঁৰ সাহিত্যৰ উপযোগিতা সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ আৰু সাহিত্য-গৱেষকৰ বাবে সমান মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। মাৰ্কছবাদী সমাজতত্ত্বৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ গল্পসমূহ এক নিৰ্ভৰযোগ্য উপাদান। শ্ৰেণিসংঘাত, অৰ্থনৈতিক বৈষম্য আৰু ক্ষমতাবানৰ দমননীতিক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ এই গল্পসমূহ উপযুক্ত। আনহাতে, নাৰীবাদী দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁৰ লেখনীত তীব্ৰ তাৎপৰ্য প্ৰকাশ পাইছে। নাৰীৰ ওপৰত দ্বৈত শোষণ, অৰ্থনৈতিক আৰু লিঙ্গভিত্তিক বৰ্ণনা কৰাত তেওঁৰ গল্পবোৰ বিশেষ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে উপনিবেশ-উত্তৰ চিন্তাধাৰাৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ সাহিত্য বিশেষ প্ৰাসঙ্গিক।

ভাষাশৈলীৰ দিশত ঝুমুৰ পাণ্ডে সৰলতা আৰু প্ৰাঞ্জলতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। তেওঁৰ বাক্যগঠন সৰল, অথচ তাত থকা অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু সংবেদনশীলতা পাঠকৰ হৃদয়ত গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। দৈনন্দিন জীৱনৰ সৰু-সৰু ঘটনা, বেদনা আৰু আনন্দৰ খণ্ডচিত্ৰ তেওঁ বাস্তৱধৰ্মী ৰূপত উদ্ভাসিত কৰিছে। এই বাস্তৱধৰ্মিতা সাহিত্যক অধিক প্ৰাণবন্ত কৰি তোলে। সমাজ-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ঝুমুৰ পাণ্ডে'ৰ স্থান একেবাৰে অনন্য। অসমৰ সাহিত্যিক মানচিত্ৰত বৰাক উপত্যকাৰ সাহিত্য যি স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, তাত তেওঁৰ অৱদান গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৰাক উপত্যকাৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ, ভাষা, পৰম্পৰা আৰু সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনচৰ্যাৰ এক প্ৰামাণ্য চিত্ৰ তেওঁ সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়াইছে।

ঝুমুৰ পাণ্ডে কেৱলমাত্ৰ এজন গল্পকাৰ নহয়, তেওঁ এজন সমাজচিন্তক, যি নিপীড়িত আৰু বঞ্চিত সমাজৰ স্বৰ সাহিত্যৰ পাতত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ গল্পসমূহ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বহুমুখী দিশ উন্মোচন কৰে। আজিও সমাজত ন্যায়, সমতা আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰাসঙ্গিকতা যিমান বৃদ্ধি পাইছে, তাত ঝুমুৰ পাণ্ডে'ৰ সাহিত্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। সাহিত্যৰ যোগেদি সমাজক সঁচা পথত আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টাই তেওঁৰ লেখনীৰ মুখ্য প্ৰেৰণা। সেইবাবে ঝুমুৰ পাণ্ডে অসমৰ বাংলা সাহিত্যত এক সজীৱ দলিল হিচাপে চিৰদিনৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ থাকিব।

আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত :

১. ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহত চাবাগানীয়া নিম্নবৰ্গীয় জীৱনৰ দাৰিদ্ৰ্য, কষ্ট আৰু শোষণ সজীৱ ৰূপে প্ৰতিফলিত হৈছে।

২. গল্পবোৰে দেখুৱাইছে যে, কিদৰে কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস সমাজৰ নৈতিকতাৰ মূলে আঘাত হানে আৰু গোটৰ বিকাশত বাধা প্ৰদান কৰে।

৩. তেওঁৰ ৰচনাত নাৰীৰ নিপীড়ন, দেহ-মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্ৰণা আৰু মুক্তিৰ স্বপ্ন এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে।

৪. সাবঅল্টাৰ্ণ চেতনা, মাৰ্ক্সবাদী সমাজ-দৃষ্টিকোণ আৰু নাৰীবাদী দিশ একেলগে মিলি সামাজিক-তাত্ত্বিক পাঠৰ আধাৰ গঠন কৰিছে।

৫. ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ গল্পসমূহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যত স্বতন্ত্ৰ স্বকীয়তা আৰু সামাজিক সজাগতাৰ এক মূল্যবান দলিল ৰূপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে।

৬. ভৱিষ্যতত ঝুমুৰ পাণ্ডেৰ সাহিত্যৰ সৈতে তুলনামূলকভাবে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য আঞ্চলিক লেখকৰ নিম্নবৰ্গীয় চেতনা আৰু নাৰীবাদী সাহিত্যক বিশ্লেষণ কৰি এক বিস্তৃত সমাজ-সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন সম্পাদন কৰা সম্ভৱ।

প্ৰসঙ্গ টোকা :

১. ঝুমুৰ পাণ্ডে, ডাইনি, পৃ ৩০
২. তদেৱ, পৃ ৩০
৩. তদেৱ, পৃ ২৯
৪. ঝুমুৰ পাণ্ডে, বিবৰ্ণ দ্বিপ্ৰহৰ, পৃ ৬২
৫. ঝুমুৰ পাণ্ডে, অধিকাৰ, পৃ ৪৫

গ্ৰন্থপঞ্জি :

আকৰ গ্ৰন্থ :

১. পাণ্ডে, ঝুমুৰ, গেৰাম থানেৰ মানুষটা ও দুলিয়া, প্ৰথম প্ৰকাশ ২৪শে মার্চ, ১৯৯৭, কফি হাউস প্ৰকাশনী, কলকাতা ৬।

সহায়ক গ্ৰন্থ :

১. ভদ্ৰ, গৌতম, নিম্নবৰ্গেৰ ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্ৰণ, ২০১০।
২. ভট্টাচার্য, দেবাশিস, বিশ শতকেৰ বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবৰ্গীয় চেতনা, প্ৰথম প্ৰকাশ বইমেলা, ২০১০, অক্ষৰ পাবলিকেশন, আগৰতলা, ত্ৰিপুৰা।
৩. চৌধুৰী, ভূদেৱ, বাংলা সাহিত্যেৰ ছোটগল্প ও গল্পকাৰ, ৪র্থ সংস্কৰণ, ১৯৮৯, মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা।
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নাৰায়ণ, ছোটগল্পেৰ সীমাৰেখা, ৩য় সংস্কৰণ, ১৪১২, বি. এস বাক্ সাহিত্য, কলকাতা।
৫. দেবসেন, সুবোধ, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্ৰাত্য সমাজ, দ্বিতীয় সংস্কৰণ, পুস্তক বিপণি ২০১২, কলকাতা।
৬. চক্ৰবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পেৰ বিষয় আশয়, পুস্তক বিপণি ২০০৪, কলকাতা।
৭. মাইতি, শিশিৰকুমাৰ, সামন্ত্ৰতান্ত্ৰিক ভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, আশাবাড়ি পাবলিকেশন, ২০০৯, হাওড়া।
৮. চক্ৰবর্তী, সুধীৰ, ব্ৰাত্য লোকায়ত লালন, নবযুগ প্ৰকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্ৰণ ফেব্ৰুয়াৰী ২০১৮, ঢাকা।
৯. চক্ৰবর্তী, ড০ ভাস্বতী (লাহিড়ী), সামাজিক ও অৰ্থনৈতিক প্ৰেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-১৯৫০), দে'জ সংস্কৰণ মাঘ ১৪০৯, পুস্তকমেলা, কলকাতা।

অন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTARMUKH

Bilingual Research Journal Subjective to Literature, Society and Culture
(A Peer Reviewed Journal)

Vol-15 Issue-3 Quarterly January-March 2026

["Published with financial assistance from the Central Institute of Indian Language (Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India) Manasagangotri, Mysore 570 006 vide sanction letter F. No. 53-2(7)/2014-15/BEN/ LM/ GRNT dated 5th Decenber 2016 under the Little Magazine scheme of Grant-in-aid".]

সমাজ; সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

The impact of Globalization on society, literature and culture

Editor
Sampa Samanta Bag

'Sampan'
Badsahi Road, Bhangakuti, Burdwan

Vol. : 15 Issue : 3 Quarterly Journal

ISSN 2249-3751

অন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTARMUKH

Bilingual Research Journal Subject to Literature, Society and Culture

(A Peer Reviewed Journal)



-সমাজ; সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

(পর্ব-৩)

সূচিপত্র

বাংলা বিভাগ
(Bengali Section)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসে বিশ্বায়ন ও পরিবেশ সমস্যা	সুমন মণ্ডল	৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজনীন ঐক্যবোধের ধারণা : একটি মূল্যায়ণ	ড. শতাব্দী ভৌমিক	১৭
বিশ্বায়ন ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প	জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্তী	২৪
বিশ্বায়ন ও বিশ্ব মিডিয়া	দেবান্দনা ব্যানার্জী	৩৩
বিশ্বায়ন ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন : একটি বিশ্লেষণ	রূপক দাস	৪৩
রবীন্দ্র-পরবর্তী রবীন্দ্রসংগীতে বিশ্বায়ন-উপযোগী পরিবেশনগত বহুত্ব : ১৯৬১-১৯৮০ সময়কালে ভিনাইল বা গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের সমীক্ষা	সোমঋতা সরকার	৫২
সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রতিফলন : শ্যামল ভট্টাচার্যের গল্পের পাঠ	রেশ্মী বীর	৬২

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রতিফলন : শ্যামল ভট্টাচার্যের গল্পের পাঠ

রেশ্মী বীর

Abstract

From a research-based perspective, the stories in the 'Jamichalang' collection by the noted Tripura based storyteller Shyamal Bhattacharya reflect the multidimensional transformations of contemporary society under the influence of globalization. According to theories of globalization, economic liberalization, technological advancement, the expansion of mass media, and increased cultural exchange have intensified global influences on local societies and cultures. These transformations are artistically represented in the stories of this collection through various social, environmental, and psychological dimensions.

Stories such as 'Chakrabarti Bakraban' and 'Nirmosi' portray the changing relationship between humans and nature due to modern technology, military infrastructure, and rapid urbanization. In 'Putuli' and 'Timb' the pressures of a competitive education system, professional demands, and the transformation of family values in a globalized society are critically explored. Meanwhile, stories like 'Re Adami' and 'Pother Shesh' highlight issues such as the rapid flow of information through global media, political instability, and crisis of identity.

In this research paper we scholarly viewpoint these stories analysed the social transformation, environmental crisis, and psychological alienation produced by globalization through both sym-

bolic and realistic narrative strategies. Therefore, the 'Jamichalang' collection can be considered an important literary document of Globalization in Bengali literature that reflects changing social realities.

Keywords : Tripura, Society, Story, Globalization, Literature, Crisis, Transformation.

Methodology : এই গবেষণা-পত্রটি মূলত গুণগত এবং পাঠ-নির্ভর বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। গবেষণার প্রধান উৎস হল 'জামিছলঙ' গল্পসংকলনের নির্বাচিত গল্পসমূহ। গবেষণায় মূলত পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় বিশ্বায়ন তত্ত্বকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বায়নের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দিকগুলি গল্পের বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক গবেষণাপত্র, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহকে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

Literature Review : ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্পকার শ্যামল ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্ম নিয়ে উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক আলোচনা আমাদের তেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পসমূহ পুর্নপাঠের মাধ্যমে একটি গবেষণাভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষত বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পগুলির অন্তর্নিহিত ভাবনা ও ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ এই আলোচনা-পত্রকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে এই প্রত্যাশাই আমাদের প্রেরণা।

মূল আলোচনা :

এক

বাংলা কথাসাহিত্যের সমকালীন পরিসরে শ্যামল ভট্টাচার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র নাম। সাহিত্যিক, অনুবাদক এবং ভাষাবিদ এই তিন পরিচয়ের সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন গড়ে ওঠেছে এক বহুমাত্রিক সৃজনপ্রবাহে। ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরার আগরতলায় জন্মগ্রহণ করা শ্যামল ভট্টাচার্য শিক্ষাজীবন থেকেই বহুভাষিক সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পরিসরের সঙ্গে যুক্ত হন। পেশাগত জীবনের শুরুতে তিনি ১৯৮১ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় এয়ারক্রা কন্ট্রোলার হিসেবে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ দুই দশক

ধরে এই দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সাল পর্যন্ত এই সামরিক পেশায় কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকর্মে এক বিশেষ বাস্তবতাবোধ ও জীবনদৃষ্টির জন্ম দেয়। বিমানচালনা, প্রযুক্তিনির্ভর পেশা, যুদ্ধপরিস্থিতি, সামরিক শৃঙ্খলা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এইসব অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে নানা প্রতীকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবেদনশীল ও গবেষণামূলক দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যকর্ম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিসরে বিশ্বায়ন, বহু সাংস্কৃতিক এবং মানবিকতার প্রশ্নকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ করে দেয়। এই নতুন ভাবধারায় তাঁর সৃজনশীল লেখার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'জামিছলঙ' গল্পসঙ্কলনে।

দুই

১৯৯৯-এর 'জামিছলঙ'-এর প্রথম সংস্করণে 'চক্রবর্তী বক্রবান' গল্পটিকে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি কেবল একজন সামরিক পাইলটের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প নয়; বরং সমকালীন বিশ্বায়িত সমাজে ব্যক্তি, রাষ্ট্র, পেশা এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের একটি প্রতীকী উপস্থাপন। বিশ্বায়ন মূলত অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের দ্রুত বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীকে একটি আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবনযাত্রা, পেশা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্পর্ক গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। গল্পটিতে এই পরিবর্তনের নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পে প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক পেশাজগতের যে চিত্র দেখা যায় তা বিশ্বায়নের সরাসরি ফল। রঞ্জন একজন ফাইটার পাইলট, যার কাজ সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক এভিয়েশন প্রযুক্তি, ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্লাইং, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, রেডিও টেলিফোন এসবই বিশ্বায়িত প্রযুক্তি ব্যবস্থার অংশ। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল ব্যবস্থায় নিরাপত্তা ও যোগাযোগের জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তা বিশ্বব্যাপী। ফলে একজন পাইলটকে ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়ে যন্ত্রের তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। গল্পে রঞ্জনের দিগ্‌ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা এই প্রযুক্তিনির্ভরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে যেখানে মানুষ নিজের অনুভূতির উপর আস্থা হারিয়ে যন্ত্রের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়। বিশ্বায়িত প্রযুক্তি ব্যবস্থায় মানুষের এই নির্ভরতা আধুনিক জীবনের একটি বাস্তবতা। এছাড়াও, গল্পে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও বাজারব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তা বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাবকে নির্দেশ করে। রঞ্জনের দাদার চিঠিতে দেখা যায় যে শিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে

বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতা কতটা তীব্র হয়ে উঠেছে। টিউশনের বাজারে প্রশ্নপত্র পাওয়ার সুবিধা বা সাজেশন-এর মতো বিষয়গুলো শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি পণ্যবাজারে পরিণত করেছে। বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষা ধীরে ধীরে একটি বাজারজাত পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে জ্ঞান নয়, বরং পরীক্ষায় সাফল্য ও অর্থনৈতিক লাভ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠছে। এই বাস্তবতা শুধু ভারতের নয়— বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের একটি উদাহরণ।

গল্পটিতে সামাজিক ও পেশাগত কাঠামোর পরিবর্তনের বিষয়টিও বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। রঞ্জনের চিঠিতে উল্লেখ আছে যে যারা আগে সাধারণ শ্রমিকের কাজ করত তারা এখন ক্যাটারিং সার্ভিসে আধুনিক পোশাক পরে কাজ করছে। এটি পরিষেবা অর্থনীতির একটি দৃষ্টান্ত। বিশ্বায়নের ফলে পরিষেবার দ্রুত বিস্তার হয়েছে এবং নতুন ধরনের পেশা তৈরি হয়েছে। ঐতিহ্যগত পেশার পরিবর্তে বাজারচাহিদা অনুযায়ী নতুন পেশা গড়ে ওঠেছে। এর ফলে সমাজের পেশাগত কাঠামো ও সামাজিক মর্যাদার ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। একই সঙ্গে গল্পে পরিবেশগত পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত রয়েছে তা বিশ্বায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে যুক্ত। হাতির লোকালয়ে নেমে আসার প্রসঙ্গ, বনভূমি ধ্বংস ও নগরায়ণের ফলে বন্যপ্রাণী তাদের স্বাভাবিক আবাস হারাচ্ছে। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে বনভূমি হ্রাস, নগর বিস্তার এবং পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। গল্পে এই পরিবর্তনটি খুব সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনও গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। রঞ্জনের পরিবারে অর্থনৈতিক চাপ, অসুস্থ বাবার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব এবং ভাইদের আলাদা হয়ে যাওয়া এই ঘটনাগুলি আধুনিক সমাজে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। বিশ্বায়নের ফলে কর্মসংস্থানের জন্য মানুষকে স্থানান্তরিত হতে হয়, যার ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট পরিবারে পরিণত হয়। এর ফলে পারিবারিক দায়িত্ব ও সম্পর্কের ধরনও পরিবর্তিত হয়।

'সমস্ত মনোযোগ আর্টিফিশিয়াল হরাইজনে কেন্দ্রীভূত করে উইংটাকে সেভাবেই ব্যালান্স করি আর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ভাবি যে, ইয়েস, এখুনি সংকট কেটে যাবে' ১ গল্পে মানুষের এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত। প্রযুক্তি, প্রতিযোগিতা ও সামাজিক পরিবর্তনের চাপ মানুষের মধ্যে এক ধরনের দিকভ্রান্তি বা মানসিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। রঞ্জনের অভিজ্ঞতা এই মানসিক দিকভ্রান্তির একটি প্রতীকী প্রকাশ। এই প্রকাশে প্রযুক্তির অগ্রগতি, বাজারের প্রতিযোগিতা এবং

সামাজিক পরিবর্তন মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

তাঁর 'নির্মোসী' গল্পটি বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে এটি কেবল একটি প্রকৃতি-নির্ভর স্মৃতিগাথা নয়, বরং আধুনিক বিশ্বায়িত সভ্যতার ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত সংকট ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এক সূক্ষ্ম পরিচয় ধরা পড়ে। বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, দ্রুত শিল্পায়ন, সামরিক ও প্রযুক্তিগত বিস্তার এবং নগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন। গল্পে এয়ারবেস, জেট ইঞ্জিন, কংক্রিটের প্রশস্ত ট্যাক্সি ট্র্যাক এসব উপাদান সেই আধুনিক উন্নয়নকেই প্রতীকায়িত করে। একসময় যে অঞ্চলে ঘন অরণ্য, অসংখ্য পাখি ও প্রাণীর বাস ছিল, সেখানে বর্তমান যান্ত্রিক শব্দ, সামরিক অবকাঠামো এবং কংক্রিটের দাপট প্রকৃতিকে সংকুচিত করে ফেলেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে উন্নয়নের এই মডেল পৃথিবীর নানা প্রান্তে একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাচীন সহাবস্থান ক্রমে ভেঙে যাচ্ছে।

গল্পে নুব্রার মন্তব্য, 'এয়ারবেসের বাইরে কোথাও সবুজ নেই, চারিদিকে লোকালয় ও কলকারখানা'[২] বিশ্বায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে দর্শায়। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। নদীও যেন পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হয়েছে এই উপমা বিশ্বায়িত উন্নয়নের পরিবেশগত মূল্য কত ভয়াবহ হতে পারে তা স্পষ্ট করে।

সুতরাং, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে 'নির্মোসী' গল্পটি মূলত উন্নয়ন ও প্রকৃতির সংঘাত, স্মৃতি ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব এবং পরিবেশ রক্ষার জরুরি প্রয়োজনকে তুলে ধরে। গল্পটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্বায়নের দ্রুত গতির উন্নয়ন যদি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারে, তবে সেই উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'নির্মোসী' শুধু একটি গল্প নয়, বরং সমসাময়িক বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতার এক গভীর সাহিত্যিক অভিব্যক্তি।

তিন

বিশ্বায়নের যুগে বাংলা সাহিত্য নতুন এক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। প্রযুক্তি, তথ্যপ্রবাহ, প্রতিযোগিতা, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং ব্যক্তি-মানসের রূপান্তর এসবই সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'পুতলি' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পটি কেবল একটি ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণনা নয়; বরং বিশ্বায়নের যুগে শিশুমন, পারিবারিক আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক

প্রতিযোগিতা এবং মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের উপর চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিম প্রত্যাশার গভীর সংকটকে তুলে ধরে। ফলে গল্পটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক কিশোরী নাম পুতলি, যে ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাহন হয়ে ওঠে। বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যম, টেলিভিশন এবং আন্তর্জাতিক রেকর্ড-এর সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। গল্পে দেখা যায়, টেলিভিশনে প্রচারিত বিশ্বরেকর্ডের অনুষ্ঠান দেখে বাবা-মা নিজের সন্তানকে অসাধারণ প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সাত বছর বয়সে কেউ বিমান চালাচ্ছে, কেউ পাঁচ ঘণ্টা নাচছে এইসব উদাহরণ তাদের মনে এক ধরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ শিশুটি স্বাভাবিক শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অস্বাভাবিক শিক্ষার ভার। এখানে লেখক বিশ্বায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরেছেন বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে যেমন প্রসারিত করে, তেমনি তা অনেক সময় অবাস্তব প্রত্যাশার জন্ম দেয়।

'পুতলি' গল্পে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্বটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই পুতলি চরিত্রটি অসংখ্য তথ্য ও সূত্র মুখস্থ করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয় এবং অল্প বয়সেই রেকর্ড বইয়ে তার নাম ওঠে। কিন্তু বাস্তব জীবনের সামাজিক যোগাযোগ, ভাষা, অনুভূতি ও সম্পর্কের জটিলতা বোঝার ক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ে। স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারা, তাদের হাসাহাসি, শিক্ষকদের ব্যাখ্যা বুঝতে অসুবিধা এসব অভিজ্ঞতা তাকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। এই দিকটি বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষাব্যবস্থার এক গভীর সংকটকে সামনে আনে। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক সমাজে অনেক সময় জ্ঞানকে শুধুমাত্র তথ্যের সঞ্চয় হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু মানবিক অনুভূতি ও সামাজিক দক্ষতার গুরুত্ব উপেক্ষিত থাকে। ফলে ব্যক্তি এক ধরনের যান্ত্রিক সত্তায় পরিণত হয়। 'এই মহাকাশে এরকম অসংখ্য প্রাণহীন উপগ্রহ ঘুরছে সুতো বাঁধা পুতুলের মতন। পুতুলেরা ঘুরছে অপত্য স্নেহের মহাকর্ষে।'[৩] 'পুতলি' গল্পটি এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এখানে ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্মৃতি ও উপলব্ধি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে পাঠক সহজেই চরিত্রটির মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বাংলা ছোটগল্পকে নতুন এক গভীরতা প্রদান করেছে।

'টিম্ব' গল্পটি মূলত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্গত মানসিক সংকট, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অসহায়তাকে কেন্দ্র করে রচিত। গল্পটির পটভূমি একটি শীতের সকাল, যেখানে বাবার মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধের আচার সম্পন্ন করার প্রস্তুতি চলছে। উপরিভাগে এটি একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও গল্পটির গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, এখানে আধুনিক সমাজের নানা পরিবর্তন, বিশেষ করে বিশ্বায়নের প্রভাবও সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত। বিশ্বায়নের ফলে সমাজে যে নতুন চিন্তা, পেশাগত পরিবর্তন, সামাজিক টানাপোড়ন এবং সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তার প্রতিফলন এই গল্পে বিভিন্ন প্রতীক, ঘটনা এবং চরিত্রের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পটিতে, আধুনিক পেশাগত চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গটি বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের মৃত বাবা সারাজীবন নিজেকে একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে মানুষের সেবা করাই তাঁর ধর্ম। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার বা আচারকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। এই মনোভাব আধুনিক মানবতাবাদী চিন্তার প্রতিফলন, যা বিশ্বায়নের যুগে আরও বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে ধর্মীয় কুসংস্কার বা প্রথাগত বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে যুক্তিবাদী ও মানবিক চিন্তার দিকে ঝুঁকছে। গল্পের বাবার চরিত্রে সেই আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষিত সন্তানরাই আবার সামাজিক চাপ ও পারিবারিক দায়িত্বের কারণে সেইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বটি আধুনিকতা ও প্রথাগত সংস্কারের সংঘর্ষকে তুলে ধরে, যা বিশ্বায়নের যুগে সমাজে প্রায়শই দেখা যায়।

এছাড়া গল্পটিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার যে চিত্র উঠে এসেছে, সেটিও বিশ্বায়নের যুগের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। গল্পে উল্লেখ আছে যে পালস্ পোলিও কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া মেডিকেল টিমের ওপর উগ্রপন্থীরা গুলি চালিয়েছে। পালস্ পোলিও কর্মসূচি মূলত একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উদ্যোগের অংশ, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবী থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করার চেষ্টা চলছে। এই কর্মসূচির উপস্থিতি গল্পে বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে নির্দেশ করে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতি ও মানবকল্যাণমূলক উদ্যোগের বিস্তার। কিন্তু একই সঙ্গে উগ্রপন্থী হামলার ঘটনাটি দেখায় যে, আধুনিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ অনেক সময় স্থানীয় রাজনৈতিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়। ফলে বিশ্বায়নের ইতিবাচক উদ্যোগ এবং স্থানীয় বাস্তবতার সংঘাত এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

তদুপরি গল্পটিতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাণিজ্যিকীকরণের দিকটিও লক্ষণীয়। মহাপুরোহিতের চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি এক ধরনের পেশাদারিত্ব ও অর্থনৈতিক হিসাব। তিনি আগেই রিকশাভাড়া ভাঙতি নেওয়ার কথা বলেন, সিগারেট ধরান, এবং নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দ্রুত কাজ শেষ করে অন্যত্র যাওয়ার তাড়া অনুভব করেন। এই আচরণ ধর্মীয় আচারকে এক ধরনের পরিষেবা বা পেশাগত কাজে পরিণত করেছে। বিশ্বায়নের যুগে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পেশাদারিত্ব ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ প্রবেশ করেছে। ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনেক সময় একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লেনদেনে রূপান্তরিত হয়। গল্পে মহাপুরোহিতের আচরণের মাধ্যমে এই পরিবর্তনটি সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। আধুনিক মানবতাবাদী চিন্তা, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উদ্যোগের উপস্থিতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পেশাদারীকরণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সংকট এই সমস্ত বিষয় গল্পটিকে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

চার

'জামিছলঙ' গল্পটি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক বাস্তবতা, লোকবিশ্বাস, আধুনিক চিকিৎসা এবং বিশ্বায়নের যুগে মানুষের অস্তিত্ব সংকট এই সমস্ত বিষয় একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। গল্পটি বহুমাত্রিক বর্ণনা ও প্রতীকের মাধ্যমে এমন এক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে, যেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা ক্রমে বিশ্বায়নের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। এই রচনায় গ্রামীণ ও আদিবাসী সমাজের জীবনধারা, ঐতিহ্য, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানুষের মানসিক অবস্থাকে আধুনিক সভ্যতা ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে গল্পটি শুধু একটি আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার বিবরণ নয়, বরং বিশ্বায়নের যুগে মানুষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের এক গভীর সাহিত্যিক দলিল হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়ন মূলত এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং জীবনযাত্রা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর বহিরাগত প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় 'জামিছলঙ' গল্পে এই প্রভাবটি বহুস্তরে উপস্থিত। গল্পের শুরুতেই ভগবতীর জীবনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের একটি মানবিক ও সামাজিক দিক প্রকাশ পায়।

ভগবতী একজন দরিদ্র নারী, যিনি নিজের সন্তানকে না খাইয়ে অন্যের সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এখানে আমরা দেখতে পাই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি কঠোর বাস্তবতা। বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়ন ও আধুনিকতার কথা বলা হলেও সমাজের নিচুতলার মানুষ এখনও জীবিকার জন্য নিজের শরীরকেও শ্রমে পরিণত করতে বাধ্য হয়। ভগবতীর দুধ শুধু মাতৃত্বের প্রতীক নয়, এটি শ্রম, ত্যাগ এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনেরও প্রতীক। এই বাস্তবতা দেখায় যে বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেক সময় মানুষের মৌলিক মানবিক সম্পর্কগুলিকেও বাজারের অংশে পরিণত করে।

এছাড়া গল্পে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে চিত্র উঠে এসেছে তাও বিশ্বায়নের প্রভাবকে স্পষ্ট করে। আধুনিক হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি এখানে উপস্থিত থাকলেও সেগুলি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বুলবুলির অসুখের চিকিৎসার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, তা দরিদ্র মানুষের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। ফলে তারা বাধ্য হয়ে লোকচিকিৎসা বা ওঝার কাছে যায়। কেরাঙ কবিরাজ বা ওচাই চরিত্রটি এখানে শুধু একজন লোকচিকিৎসক নয়— তিনি স্থানীয় সংস্কৃতি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রাচীন জ্ঞানের প্রতীক। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার পাশাপাশি এই লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতির উপস্থিতি দেখায় যে বিশ্বায়নের যুগেও স্থানীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্য পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সেই ঐতিহ্যের ওপরই নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

গল্পটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাজার অর্থনীতি ও ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসার। লেপ কেনার ঘটনাটি এখানে একটি প্রতীকী দৃশ্য। বুলবুলি ও হরিদাসের মতো দরিদ্র মানুষের কাছে একটি লেপ শুধুমাত্র শীত নিবারণের বস্তু নয়; এটি স্বপ্ন, নিরাপত্তা এবং ভালো জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কিন্তু সেই লেপ কেনার ক্ষেত্রেও বাজারের কঠোর নিয়ম তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দরকষাকষির সেই দৃশ্যটি দেখায় যে বাজারব্যবস্থা মানুষের প্রয়োজনকে নয়, বরং লাভকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বিশ্বায়নের ফলে এই বাজারব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং মানুষের জীবনযাত্রার ওপর তার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'জামিছলঙ' গল্পে প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের প্রভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পে সিনেমা, ভিডিও, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র তারকার উল্লেখ রয়েছে। শ্রীদেবী, মাধুরী বা জুহির মতো চলচ্চিত্র তারকাদের উপস্থিতি দেখায় কীভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতি মানুষের কল্পনা ও বাস্তবতার সীমানা ভেঙে দিয়েছে। প্রধান চরিত্রটি নিজের জীবনকে

যেন একটি সিনেমার দৃশ্য হিসেবে দেখতে শুরু করে। বাস্তবতা ও কল্পনার এই মিশ্রণ বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের গভীর প্রভাবকে তুলে ধরে। গণমাধ্যম মানুষের চিন্তা, স্বপ্ন এবং আত্মপরিচয়কে নতুনভাবে নির্মাণ করে। ফলে মানুষ অনেক সময় নিজের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ধরনের কল্পনার জগতে বাস করতে শুরু করে।

এখানে আঞ্চলিক ভাষা, লোককথা, আধুনিক বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সবকিছু একসঙ্গে মিশে গেছে। গাল্ফ যুদ্ধের উল্লেখ, শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানীদের নাম কিংবা আধুনিক প্রযুক্তির উপস্থিতি গল্পটিকে একটি বৃহত্তর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত করে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা ও লোকজ উপাদান গল্পটিকে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। এই দুই ধারার সমন্বয়ই বিশ্বায়নের যুগে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সবশেষে বলা যায়, 'জামিছলঙ' গল্পটি বিশ্বায়নের যুগে বাংলা সাহিত্যে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। এটি দেখিয়েছে যে বিশ্বায়ন শুধু অর্থনীতি বা প্রযুক্তির পরিবর্তন নয়—এটি মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, সম্পর্ক এবং মানসিকতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

পাঁচ

আধুনিক যুগে বিশ্বায়ন শুধু অর্থনীতি বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের চিন্তাভাবনা, সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার ধরনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রতিফলন সাহিত্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'পথের শেষ' গল্পটিতে ব্যক্তিমানস, সমাজের রূপান্তর এবং সময়ের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বিশ্বায়নের প্রভাব সূক্ষ্ম অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মধুকর দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে আসে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান কেবল ব্যক্তিজীবনের নয়, সমাজেরও গভীর পরিবর্তনের সূচক। বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগ, তথ্যপ্রবাহ এবং বাজারকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিস্তার সমাজের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। ট্রেনের কামরার দেয়ালে দেখা নানান ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নাম করে যৌন সমস্যার গোপন চিকিৎসার প্রচার এই পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার একটি প্রতীক। একসময় যেখানে ট্রেনের দেয়ালে শুধুমাত্র সতর্কতামূলক নোটিশ বা রাজনৈতিক লিফলেট দেখা যেত, সেখানে এখন বাজারকেন্দ্রিক ভোগবাদী

সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। এটি বিশ্বায়নের ফলে তৈরি হওয়া বাজারমুখী সমাজের একটি বাস্তব চিত্র।

এছাড়া গল্পে গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনের প্রসারও বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞাপন শুধু পণ্যের প্রচার নয়, মানুষের মানসিকতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও প্রভাবিত করে। মধুকরের কাছে এই বিজ্ঞাপনগুলো অস্বস্তিকর এবং অশ্লীল মনে হলেও নতুন প্রজন্ম যেন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই অবস্থাটি প্রজন্মগত মানসিক পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দেয়, যেখানে বিশ্বায়নের প্রভাবে সমাজের নৈতিকতা ও সংবেদনশীলতার ধরন পাল্টে যাচ্ছে।

গল্পে রাজনৈতিক বাস্তবতার কথাও উল্লেখযোগ্য। মধুকরের অতীত জীবনে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এবং পরে সেই আন্দোলনের ভাঙন এই ঘটনাগুলি বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক আদর্শের সংকটকে প্রতিফলিত করে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্ব রাজনীতিতে মতাদর্শভিত্তিক সংগ্রামের দুর্বলতা এবং বাজারমুখী বিশ্বব্যবস্থার প্রাধান্য অনেক বিপ্লবী স্বপ্নকেই ম্লান করে দেয়। মধুকরের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন তাই বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে ওঠে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট। নাগপুরে গিয়ে মধুসূদন কর নতুন পরিচয়ে মধুকর গঙ্গাথাড়ে হয়ে ওঠে। বিশ্বায়নের যুগে মানুষের স্থানান্তর, অভিবাসন এবং নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া এই পরিচয় পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে মানুষ নিজের শিকড়ের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব অনুভব করে, যা গল্পে মধুকরের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'পথের শেষ' গল্পটিতে 'এই অস্বস্তিময় শূন্যতা যেন আদি অন্তহীন'[৪] মূলত একজন মানুষের স্মৃতি, অতীত এবং বর্তমানের সংঘাতকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও এর অন্তর্নিহিত স্তরে বিশ্বায়নের ফলে সমাজে ঘটে যাওয়া মূল্যবোধের পরিবর্তন, বাজারমুখী সংস্কৃতির বিস্তার, রাজনৈতিক আদর্শের সংকট এবং আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'লাউপাখির ডিম' গল্পটি সমসাময়িক বাংলা গল্পসাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রভাব বহুস্তরীয় রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক রূপান্তর, পারিবারিক সম্পর্কের সংকট এবং ব্যক্তিমানসের বিচ্ছিন্নতা এসবই বিশ্বায়নের যুগে নতুন বাস্তবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গল্পে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বায়নের প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে। একসময় যে দ্বীপাঞ্চল ছিল নির্বাসিত

অপরাধী ও বিপ্লবীদের আবাসস্থল, সেখানে এখন গড়ে উঠেছে সুপারমার্কেট, সিনেমা হল, পাঁচতারা হোটেল, কলেজ ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই পরিবর্তন বিশ্বায়নের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে, যেখানে যোগাযোগব্যবস্থা, পর্যটন এবং বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করে। ফলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমাজও ধীরে ধীরে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

তাছাড়াও, গল্পে মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তনও বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। পিসিমনি, পিসেমশাই, চিরশ্রী এবং অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্কের ভাঙন ও জটিলতা আধুনিক সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বৃদ্ধি এবং পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতাকে নির্দেশ করে। বিশ্বায়নের যুগে মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুত বদলে যাওয়ার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কেও এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। গল্পে দেখা যায়, একসময় যে সম্পর্কগুলো আন্তরিকতা ও আবেগে পরিপূর্ণ ছিল, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতায় রূপ নিয়েছে।

অতএব বলা যায়, 'লাউপাখির ডিম' গল্পটি কেবল একটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাহিনি নয়; বরং বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবসম্পর্কের জটিল বাস্তবতাকে প্রতীকধর্মী ও সাহিত্যিক ভাষায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। ফলে গল্পটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশ্বায়নের প্রভাব অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

'রে আদমি' গল্পটি আধুনিক বিশ্বে বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—এটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতিগত সম্পর্ক, সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবিক চেতনার ওপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। "রে আদমি!" গল্পটি মূলত একটি দাঙ্গাপীড়িত সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত স্তরে বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র, সমাজ এবং মানবিকতার সংকটকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে। গল্পটির ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রের অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে বিশ্বায়নের সঙ্গে এর সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গল্পটিতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রবাহের ভূমিকা বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। ট্রেনে যাত্রাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী হত্যার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং যাত্রীরা জানতে পারে যে এই সংবাদ প্রথমে বিবিসি (BBC)-র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য দ্রুত সীমান্ত অতিক্রম করে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে স্থানীয় বা জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাও তৎক্ষণাৎ বৈশ্বিক আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গটি

দেখায় যে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের ফলে বিশ্ব এখন এক ধরনের গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে।

এই গল্পে ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাতের বিষয়টি বিশ্বায়নের যুগের একটি জটিল বাস্তবতা হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হত্যার পর সৃষ্ট দাঙ্গা, শিখ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং জনতার সহিংস আচরণ সমাজের ভেতরে জমে থাকা বিদ্বেষের প্রকাশ। বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগব্যবস্থা যতই উন্নত হোক, সামাজিক বিভাজন এবং পরিচয়ের রাজনীতি অনেক সময় আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শিখ যুবক তেজেন্দরের জীবন রক্ষার জন্য কুশলের দাড়ি-চুল কেটে দেওয়া এই সহিংসতার মধ্যেও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়াও গল্পে বহুসাংস্কৃতিক সমাজের বাস্তবতাও প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষার মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ত্রিপুরার বাঙালি কুশল, কুমিল্লা থেকে আসা শরণার্থী নিখিল, দক্ষিণ ভারতের তেলেগু ভাষাভাষী গর্ভবতী মহিলা এবং শিখ যুবক তেজেন্দর। এই বৈচিত্র্য আধুনিক বিশ্বায়িত সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতিগত পরিচয়ের মানুষ একই সামাজিক পরিসরে বসবাস করে এবং পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি নতুন সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করে। যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের সংকটও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দাঙ্গার সময় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রেন চললেও যাত্রীদের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, রেল কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করে ঘোষণা দেয়, এবং সাধারণ মানুষ নিজেদের উদ্যোগেই জীবন রক্ষার চেষ্টা করে।

এই পরিস্থিতি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে, যা বিশ্বায়নের যুগে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অবশেষে বলা যায়, 'রে আদমি' গল্পটি কেবল একটি দাঙ্গা বা রাজনৈতিক অস্থিরতার কাহিনি নয়; এটি বিশ্বায়নের যুগে সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতা তথ্যপ্রবাহের দ্রুততা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক সংকট এবং মানবিক সহমর্মিতার গুরুত্ব এসব বিষয়কে গভীরভাবে প্রতিফলিত করেছে।

সূত্রনির্দেশ :

১. শ্যামল ভট্টাচার্য, জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ-২৪
২. শ্যামল ভট্টাচার্য, জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ-১২

৩. শ্যামল ভট্টাচার্য, জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ-১৮
৪. শ্যামল ভট্টাচার্য, জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ-৪১

সহায়ক গ্রন্থাবলি ঃ

১ খাসনবিশ, রতন, বিশ্বায়ন উন্নয়ন ও বিশ্বমন্দা, কলকাতাঃ প্রমা, ২০০৯
২ খাসনবিশ, রতন, বিশ্বায়ন ও ভারতবর্ষ অর্থনীতির ইডিওলজি, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ, মে ২০০৫
৩ চট্টোপাধ্যায়, আবীর, বিশ্বায়ন গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ, মে ২০১৩
৪ নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা), বিশ্বায়ন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন, নভেম্বর ২০১৬
৫ বসু, পথিক, (সম্পা) বিশ্বায়ন বিজ্ঞান ও কৌশল, কলকাতা, শ্রয়ণ, জুন ২০০২
৬ ভট্টাচার্য শ্যামল,*জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯।
৭ সেনমজুমদার, জহর, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০১৭

পত্র-পত্রিকা ঃ

১. বসু, সমীর (সম্পা), পদক্ষেপ ৩৪ (ক্রোড়পত্রঃ বঙ্গসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন), বইমেলা সংকলন, ডিসেম্বর,২০০৩
২. বিশ্বায়নের গোলকধাঁধায়, নাগরিক মঞ্চ ১৯৯৯
৩. বিশ্বায়নের ভেলকি, লোকায়ত পত্রিকা, পঞ্চদশ সংকলন, ১৪০৮

রেশ্মী বীর
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম।

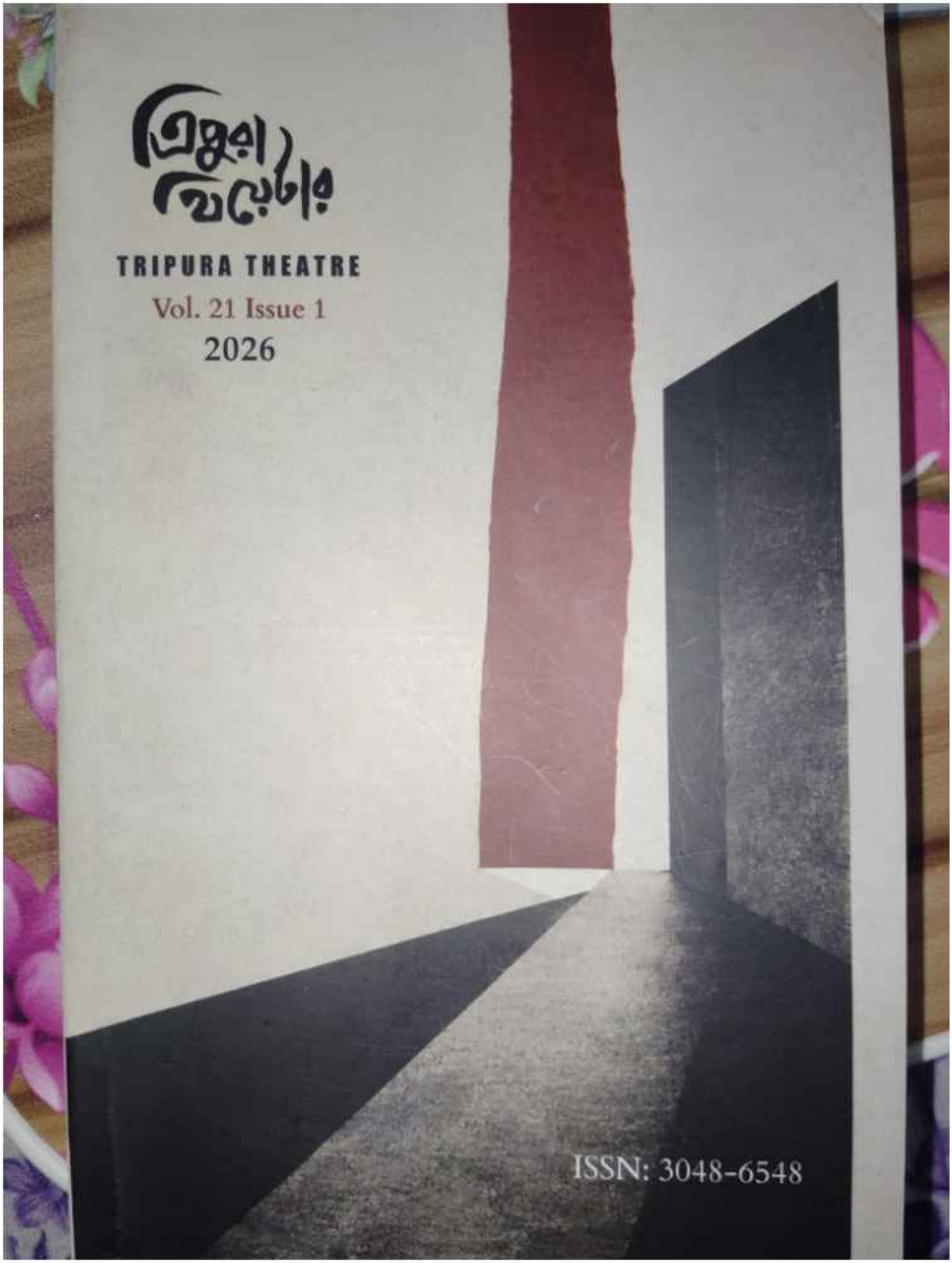
ত্রিপুরা থিয়েটার
TRIPURA THEATRE
Vol. 21 Issue 1
2026
ISSN: 3048-6548

সূচিপত্র

বাংলা প্রবন্ধ

- আমাদের শুভ্রাংশুদা — কমল মজুমদার (আগরতলা) ১৩
- বাংলা থিয়েটার: সংকট, প্রতিরোধ ও সম্ভাবনা — বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য (কলকাতা) ১৫
- ত্রিপুরায় বর্ষব্যাপী অভিনীত নাট্য তালিকা — নারায়ণ দেব (আগরতলা) ২০
- বিমল মমেন চাকমার নাটক - পর্যালোচনা — পদ্মকুমারী চাকমা (আগরতলা) ২৯
- নারীর ক্ষমতা এবং নাটকে নারীবাদ — আবদুস সেলিম (ঢাকা) ৩৫
- পরিচালক রবিশঙ্করের সঙ্গে আলাপচারিতা — আদিত্য সেন (দিল্লি) ৫৬
- জন্ম সার্ধশতবর্ষে কিরণচন্দ্র দত্ত — অপূর্ব দে (কলকাতা) ৬৭
- সংরক্ষণে 'সৌমাইনি খুম্পুই' এবং মঞ্চনাটকের ভূমিকা — ধনুরাজ নোয়াতিয়া (আগরতলা) ৭২
- ললিতা বিশ্বাস: এক বিস্মৃত অভিনেত্রীর কথা — পরমাশ্রী দাশগুপ্ত (আগরতলা) ৭৯
- পটচিত্রের নাট্যভাষা: পটুয়া পরিবেশনায় নাট্যতত্ত্বের সন্ধান — সঞ্জীব পাত্র (বিশ্বভারতী, কল) ৮৯
- বাংলা ও অসমীয়া গীতিনাট্যঃ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ এবং পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া — রেশ্মী বীর (গৌহাটি) ১০০
- মনোময় রত্নেশ্বর: কাব্যনাট্যের ভাস্কর্য — মলয় দেব (আগরতলা) ১১৪
- নারী মনস্তত্ত্বে বুদ্ধদেব বসু : প্রথম পার্থ — ঈপ্সিতা দেব (শিলচর) ১২৬
- রাজমালা থেকে রঙ্গমঞ্চ : শতবর্ষে জয়াবতী বা ত্রিপুর-সতী নাটক — রূপশ্রী দেবনাথ (গৌহাটি) ১৩২
- জন্ম শতবর্ষে : ধর্মবীর ভারতী এক ঐতিহাসিক অনুধ্যান — রাজেশ ভট্টাচার্য (আগরতলা) ১৪১
- 'এগিয়ে চলো' নাটকে কৃষকদের সম-অধিকারঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা — বিপ্লব দেববর্মা ও সমীর দেববর্মা (আগরতলা) ১৪৬

বাংলা ও অসমীয়া গীতিনাট্য
প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া

রেশ্মী বীর

বাংলা নাট্যজগতে আধুনিক গীতিনাট্য রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র নাট্যরূপ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এ ধরনের নাটকে গান ও নৃত্য বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। গীতিনাট্য শৈলীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিতে নাট্যকারের গভীর ভাবদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে অসমীয়া নাট্যজগতে গীতিনাট্য শৈলীর পরম্পরার বীজ লোকনাট্যানুষ্ঠান গুলির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে শংকরদেবের সৃষ্ট অঙ্কীয়া নাটে গীতিনাট্য শৈলীর সুষ্ঠ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক অসমীয়া নাট্যজগতে প্রকৃত অর্থে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই গীতিনাট্য রচনার সূচনা হয়। বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত এই গীতিনাট্যগুলি শিশুদের উপযোগী রচনা হলেও এর মধ্য দিয়ে রূপকধর্মী ও প্রতীকধর্মী ভাবেরও প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যমান সাদৃশ্য ও সমরূপতার ভিত্তিতে এই আলোচনায় আধুনিক অসমীয়া গীতিনাট্যকারদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব মূলক ভাবে পার্বতীপ্রসাদ বরুয়াকে গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতায় শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে গমনকারী পার্বতীপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য শৈলীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে 'সোণর সোলেঙ' ও 'লখিমী' নাটক দুইটি রচনা করেন। আধুনিক অসমীয়া নাট্যজগতকে এই নাটকদ্বয় স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করেছে। এই গবেষণা পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্বতীপ্রসাদের সংস্পর্শ লাভ এবং আলোচনার অন্তর্ভুক্ত 'সোণর সোলেঙ', 'লখিমী' নাটক দুইটির আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ রবীন্দ্রনাথ, পার্বতীপ্রসাদ, বাংলা, অসমীয়া, নাটক, সাহিত্য।

এক

পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য জগতের এক বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল ব্যক্তি। কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, নাট্যকার, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী এবং চলচ্চিত্র পরিচালক প্রতিটি পরিচয়েই তিনি স্বতন্ত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অসমীয়া সাহিত্যে 'গীতি-কবি' হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি থাকলেও নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদানও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাট্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নাট্যবিষয়কে সঙ্গীতের মাধ্যমে শিল্পসম্মত ভাবে উপস্থাপন করা। নাটকের সংলাপ, গীত এবং নৃত্যের সমন্বয়ে তিনি এমন এক অভিনব নাট্যরীতি নির্মাণ করেন, যা অসমীয়া নাট্যসাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে।

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, চিত্রকলা ও দর্শনচিন্তার এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর

সমগ্র সাহিত্যকর্মে কাব্যিকতা, সুরমাধু এবং নন্দনতাত্ত্বিক চেতনার এক অপূর্ব সংহতি লক্ষ করা যায়। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তু ও নাট্য-আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক পরিচালনা করেন। বিশেষত 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্যের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় নাট্যধারায় এক অভিনব শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন, যেখানে সঙ্গীত, নৃত্য এবং কাব্য নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ দেখা যায়। তাঁর এই গীতিনাট্যধারাই পরবর্তীকালে পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার নাট্যচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়নকালে তৎকালীন বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ পরিবেশের সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় তিনি নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাট্যের মঞ্চাভিনয় প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সভায়ও তিনি উপস্থিত থাকতেন। এমনকি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কখন কোন নাটক বা গীতিনাট্যের মঞ্চায়ন হবে, সে সম্পর্কেও তিনি সদা অবহিত থাকতেন এবং সুযোগ পেলেই সেইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যাভিনয়, বিশেষত 'নটরাজ' রূপে তাঁর নৃত্য, পার্বতীপ্রসাদকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। ফলে নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকে সমন্বিত করে শিল্পসৃষ্টি করার যে দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা পার্বতীপ্রসাদের শিল্পভাবনায় সুদূর প্রভাব বিস্তার করে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যই নয়, তাঁর মানবতাবাদী দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, জীবনবোধ এবং সাংস্কৃতিক আদর্শও পার্বতীপ্রসাদের চিন্তা ও সৃজন ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মুক্ত চিন্তাচর্চার আসর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পার্বতীপ্রসাদ নিজ গৃহে 'জোনাকী মেল'-এর আয়োজন করেছিলেন, যা অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনাও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

দুই

অসমীয়া নাট্যসাহিত্যে পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার নাট্য রচনা সংখ্যা সীমিত হলেও শিল্পগুণ ও স্বকীয়তার বিচারে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মাত্র দুটি নাটক রচনা করেছিলেন এবং উভয় নাটকই গীতিনাট্য ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই নাটকগুলিতে সংলাপের তুলনায় গান, নৃত্য এবং প্রতীকধর্মী উপস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, ঋতুচক্র, লোকজ সংস্কৃতি এবং সঙ্গীতের সমন্বয়ে তিনি নাট্যকাহিনিকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা অসমীয়া গীতিনাট্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচিত গীতিনাট্য দুইটি হলো 'সোণর সোলেঙ' এবং 'লখিমী'।

'সোণর সোলেঙ' পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার প্রথম গীতিনাট্য। সরুচরাই চা-বাগানে

অনন্ত রহস্যময় পরমব্রহ্মের সন্ধানকে ব্যঞ্জনাময় রূপে তুলে ধরার যে সাংকেতিক নাট্যশৈলী গ্রহণ করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যচিন্তার রূপ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপে, সোণর সোলেঙ নাটকটিতে বালকেরা সোণর সোলেঙ-এর সন্ধানে যে যাত্রা শুরু করেছে, তা মানুষের পরমাত্মামুখী আধ্যাত্মিক যাত্রা। পার্বতীপ্রসাদ সোণর সোলেঙ-এ বীণ-বরাগীর মাধ্যমে এই অন্বেষণের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন —

"সোণর সোলেঙ, সুখর সপোন,
চরম প্রাণর, হেঁপাহ গোপন"[৪]

প্রাণের এই আশা হল পরমব্রহ্মের প্রতি থাকা জীবের আকুলতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজানাটকেও ভারতীয় ঔপনিষদীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। উপনিষদে অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং মৃত্যু থেকে আমৃত্যুর দিকে গতি করার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষা রাজা নাটকেও ঘোষিত হয়েছে। নাটকটিতে আত্মা ও পরমাত্মার আত্মিক আকর্ষণের চিত্র রাজা ও রাণী সুদর্শনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজা নাটকের শুরুতে সুদর্শনা দাসী সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, "আলো, আলো কই, এই ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।" সুদর্শনার এই আলোর অন্বেষণ যেন জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার এক আকুল তৃষ্ণা। অতএব সোণর সোলেঙ নাটকে বিশ্বের বালকেরা সোনর সোলেঙ-এর যে অন্বেষণ শুরু করেছিল তা রাজা নাটকে রাণী সুদর্শনার রাজার কায়িকভাবে খোঁজার অন্বেষণেরই রূপান্তর মাত্র। তাঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য একটাই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি। এ যেন পরমাত্মামুখী আত্মার পরমব্রহ্ম অন্বেষণের এক অবিরত যাত্রা।

দ্বিতীয়ত, পার্বতীপ্রসাদের সোণর সোলেঙ নাটকে প্রকাশিত দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সংসারের বিষয়-বাসনায় আসক্ত মানুষ পরমব্রহ্মকে খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু খুঁজে পায় না। সোণর সোলেঙ-এ বীণ-বৈরাগীর মাধ্যমে সংসারতত্ত্বের এমন গভীর ভাব পার্বতীপ্রসাদ তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা নাটকে অমরের চরিত্রের মধ্যে এই ভাবধারা দেখা যায়। আশায় বন্দী মানুষের জীবন। আশাই মানুষকে স্বপ্নের মায়াময় পৃথিবীতে নিয়ে যায়। মায়ায় বন্দী মানুষের স্বপ্নের গোপন তত্ত্বকে খোঁজার প্রয়াসই দুই নাটকে পরিলক্ষিত হয়।

পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর ভাবনা-চিন্তায় উন্মোচিত আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করেছে। সেগুলি ক্রমান্বয়ে ভগবানের প্রতি আকর্ষণের অবস্থা, অন্বেষণের অবস্থা, স্বরূপ লাভের অবস্থা, ভগবানের সান্নিধ্য লাভ এবং মিলনপ্রাপ্তির অবস্থা। পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার সোনার সোলেঙ-এর উপনিষদীয় ভাবদৃষ্টির আলোকে আধ্যাত্মিক রহস্যবাদের ভাবানভূতি তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সেটি হল চির রহস্যময়ের স্বরূপ লাভ। তাই বালকেরা বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করে গাইছে —

"ল"রার জাক: ছিগাক আজি মনর বান্ধোন
বাঁহীর সুরত মিলক কান্দোন।
পুর্ণ প্রাণর সুরে সুরে"[৯]

একইভাবে রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকেও রাণী সুদর্শনা বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করে বলে, "তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম"[১০]

আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে অবশেষে রাণী সুদর্শনা রাজার স্বরূপ উপলব্ধি করে ব্রহ্মানন্দকে খুঁজে পেয়েছে। ঠিক সেইভাবে, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকেও সর্বদা রাজার চিঠির অপেক্ষারত অমল অবশেষে রাজার নির্মিত ডাকঘরের দিকে তাকিয়েই জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে।

পার্বতীপ্রসাদের 'সোণর সোলেঙ' একটি গীতিবহুল নাটক। গানের বাইরে নাটকটিতে দুই-একটি সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। এই সংলাপগুলিও গীতিধর্মী। পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া নিজে নাটকটির শুরুতেই একে একটি 'সুরীয়া নাট' হিসেবে অভিহিত করেছেন। নাটকটিতে মোট ১৬টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। অতএব গানের ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলে নাটকটিকে একটি গীতিনাট্য হিসেবে আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। গীতিধর্মিতা পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য। পার্বতীপ্রসাদের রচনাশৈলীতে যেমন একটি সাংগীতিক লয় বিরাজমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাতেই গীতিধর্মী ভাব পরিলক্ষিত হয়। পার্বতীপ্রসাদের কবিতাগুলিও ছিল গীতিধর্মী। কাব্যিক ভাবসম্পন্ন তাঁর এই রচনাগুলি গান হিসেবেও উপযোগী। অতএব সাহিত্য জগতে অন্য পরিচয়ের তুলনায় পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া একজন গীতিকবি জনপ্রিয়।

চার

'শারদোৎসব' (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক নাটক। এর পরেই 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনার সফল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপক ও সাংকেতিকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে। তাই কিছু কিছু নাটকের ভাববস্তু বোঝা জটিল হয়ে পড়ে। পার্বতীপ্রসাদের নাটকে রবীন্দ্রনাট্যের এমন জটিলতা দেখা যায় না। বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শৈলীর দিক থেকে পার্বতীপ্রসাদের 'সোণর সোলেঙ' নাটকটিকে সাংকেতিক নাটকের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যরীতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর 'সোণর সোলেঙ' নাটকটিতে ইউরোপীয় নাট্যরীতির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী বা তত্ত্বপ্রধান নাটকগুলির সঙ্গেই বেশি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। সুখ-আনন্দের সন্ধানে মানুষ সারাজীবন হাবুডুবু খায়। মানুষ যদি জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখে, তবে তার সুখ-আনন্দকে বাইরে খোঁজার প্রয়োজনই নেই। তা মানুষের মধ্যেই যে বিদ্যমান, এই কথাটিই সোণার সোলেঙের

অনুসন্ধানের মাধ্যমে নাটাকার বোঝাতে চেয়েছেন। 'রাজা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ পরমব্রহ্মের স্বরূপ কেবল অনুভূতির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায় এই কথাটি প্রকাশ করার জন্য রাজা চরিত্রটিকে প্রতীকী রূপে উপস্থাপন করেছেন। 'রাজা' নাটকে রাজা যেমন উপলব্ধির বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছেন, তেমনি পার্বতীপ্রসাদের 'সোণর সোলেঙ' নাটকটিও কেবল অনুভূতির দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। যার কোনো শারীরিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষয়া বালকেরা এবং রানি যে সোণর সোলেঙ ও রাজাকে খুঁজে বেড়ায়, তারা যে আসলে উপলব্ধির বিষয় এই কথাটি দুই নাটকেই প্রকাশ পেয়েছে। পার্বতীপ্রসাদের 'সোণর সোলেঙ'-এ বীণ-বরাগী বলছে, "সোণর সোলেঙ বিচারি যাওঁতে যি আনন্দ, পোয়া হ'লে সেই আনন্দ নোথাকে। সেই কারণে যাওঁতেই যি আনন্দ পাব জানিছে সিহে সোণর সোলেঙর প্রকৃত সন্ধান বুজিছে। আনন্দর রূপ দেখি পূর্ণ জীবন লাভ করিছে।"[৮]

অন্যদিকের, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা বলছে, "হয়েছে, হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে। আমার মনে হচ্ছে, যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই, তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে"।[৯]

'সোণর সোলেঙ' নাটকের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে বীণ-বরাগী-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা-র সাদৃশ্য। সংসারতত্ত্ব এবং জীবন রহস্যের সন্ধানকারী বীণ-বরাগী ও ঠাকুরদা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক। পার্বতীপ্রসাদের 'সোণর সোলেঙ' নাটকের বীণ-বরাগী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা-র অনুরূপ চরিত্র। এই বীণ-বরাগী চির-আনন্দময়ের সন্ধানে যাত্রারত বালকদের ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধির পথ দেখিয়ে দেয়। বীণ-বরাগী বৈরাগ্য সাধনার প্রতীক। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, পার্বতীপ্রসাদ বরুয়া বীণ-বরাগী চরিত্রটি অঙ্কন করার সময় রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা চরিত্রের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক চেতনায় পূর্ণ পার্বতপ্রসাদের নাটকের বীণ-বৈরাগী চরিত্রটি আধুনিক অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নাটকের ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, পঞ্চক প্রভৃতি নাট্যচরিত্রের গ্রহণের ফল বলেই মনে করা যায়।

পাঁচ

পার্বতীপ্রসাদের রচনার এমনই গীতিধর্মী প্রভাব 'লখিমী' নাটকেও দেখা যায়। প্রকৃতির জগতে ঋতুর আগমন এবং বিদায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাটকগুলি রচিত। তাই ঋতু নাটকগুলিতে সন্নিবিষ্ট গানগুলির মাধ্যমে আনন্দ এবং বিষদ উভয় ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী' রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাটকগুলির সমধর্মী। একইসঙ্গে লখিমীতে নাটকীয় পরিবেশ চিত্রণে ব্যবহৃত গানের প্রয়োগরীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পার্বতীপ্রসাদের লখিমী নাটকের শুরুতেই কন্ধরা, শুক্লা ডাওর, শেফালি প্রভৃতির দ্বারা পরিবেশিত শরতের বন্দনাসূচক এই গানটি নাটকটিতে আনন্দময় পরিবেশের চিত্র

অঙ্কনে সহায় করেছে-

"আজি
মৃদু পবনত ফুলরেণু উরে
কার বাঁহীতান বাজে দূরে দূরে।
কোন
চিত্রলেখা নাচে ছালি ধরি
স্বর্ণ নূপুর কলু জুনু করি থমকি থমকি বাজে সুরে সুরে"[১০]

রবীন্দ্রনাথের 'শেষবর্ষণ'-নাটকেও প্রকৃতির জগতে বর্ষা ঋতুর পরিবেশ তুলে ধরার ক্ষেত্রে নটরাজের আদেশক্রমে গায়ক-গায়িকা দ্বারা পরিবেশিত গানগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্ষার আবাহনসূচক এই গানটি নাটকটিতে আনন্দময় পরিবেশের সূচনা করেছে-

"আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক বাণী আনি বনমর্মরে"[১১]

অতএব ঋতুর আগমনে প্রকৃতির জগতে কীভাবে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে গানের মাধ্যমে যেমন তুলে ধরেছেন, ঠিক সেই ভাবেই পার্বতীপ্রসাদ লখিমী নাটকেও শরতের বন্দনাসূচক গানটির মাধ্যমে প্রকৃতির জগতে ঘটে যাওয়া আনন্দময় পরিবেশের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী' এবং রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাটকগুলিতে বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনের সময় প্রকৃতির জগতে একটি বিষাদময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ঋতুর বিদায়ের মুহূর্তে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান দুঃখে ভেঙে পড়েছে। পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে এই একই স্বরূপ দেখা যায়। ঋতুর আগমনে প্রকৃতির হৃদয়ে যেভাবে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তেমনি ঋতুর বিদায়েও প্রকৃতির জগতে এক বিষাদময় পরিবেশদেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে এই ধরনের নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে যে ভাবে গানের প্রয়োগরীতি গ্রহণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী' নাটকে গানের প্রয়োগরীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চরিত্রের ভাবপ্রকাশে পার্বতীপ্রসাদের ব্যবহৃত লখিমী নাটকের সমস্ত চরিত্রই প্রকৃতির উপাদান। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাটকগুলিতেও এক-দুইটি মানব চরিত্র থাকলেও অধিকাংশ চরিত্রই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে রচিত। এই প্রকৃতির চরিত্রগুলি ভাবপ্রকাশে পার্বতীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ যে গীত প্রয়োগের রীতি গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পার্বতীপ্রসাদের লখিমী এবং রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাটকসমূহে গানই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। উভয় নাট্যকারের রচনায় প্রকৃতির নানা উপাদানই নাটকের

মুখ্য চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির উপাদানে প্রাণধর্ম আরোপ করে জীবন্ত নাট্যচরিত্রে রূপ দেওয়ার এই প্রক্রিয়া কালিদাসের সাহিত্যেও দেখা যায়। অভিজ্ঞান শকুন্তলম ঋতুসংহার এবং মেঘদূত এই দৃষ্টান্তের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কালিদাসের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯০২ সালে রচিত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকেই এই সাহিত্যিক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লিখেছিলেন —

"প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথা-বার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে...।"[১১] সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঋতু নাটকগুলির সৃষ্টি। ফলে প্রকৃতিকে প্রাণধর্মে আরোপ করার ক্ষেত্রে পার্বতীপ্রসাদও এই পূর্বসূরি নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। অসমের প্রকৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও নিবিড় আকর্ষণের কারণে তিনি 'লখিমী' নাটকে নিজস্ব ভাষা ও ভাবনায় প্রকৃতির উপাদানগুলিকে মানবীয় অনুভূতি ও আবেগে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

ছয়

প্রকৃতিকে মানবীয় রূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী' নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' ও 'শেষবর্ষণ' নাটকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'লখিমী' নাটকের হেমন্তলক্ষ্মী, শরতকুঁওরী, কহুয়া, মেঘ, শোলি প্রভৃতি চরিত্র প্রকৃতিরই উপাদান। তেমনি বসন্ত নাটকে রাজা ও কবি ছাড়া বনভূমি, করবী, মাধবী, বকুল, নদী, মালতী, ঋতুরাজ, বসন্ত, জবা, দীপশিখা প্রভৃতি চরিত্র প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রতীক। উভয় নাট্যকারই মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, বিরহ-বেদনা ইত্যাদি মানসিক অনুভূতিকে প্রকৃতির এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। ফলে জড় প্রকৃতিও গান ও নৃত্যের মাধ্যমে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয় নাট্যকারই শরতকে এক নারীমূর্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন। পার্বতীপ্রসাদের গানে শরৎ নৃত্য-গীতে পারদর্শী। উষার সখী চিত্রলেখা, আর রবীন্দ্রনাথের শেষবর্ষণ-এ শরত 'শরৎলক্ষ্মী' বা শরৎ-প্রতিমা। এই দিক থেকে প্রকৃতি-চরিত্রে মানবীয় অভিব্যক্তি প্রকাশে লখিমী ও রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাটকের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পার্বতীপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ অসমের প্রকৃতির প্রতি পার্বতীপ্রসাদের নিবিড় ভালোবাসা এবং গভীর আকর্ষণ ছিল। তাই পার্বতীপ্রসাদ নিজস্ব ভাব-ভাষায় 'লখিমী'-তে প্রকৃতির উপাদানগুলির উপর মানবীয় সহজাত ভাব-অনুভূতির মাধ্যমে প্রাণধর্ম আরোপ করেছেন।

গানের মাধ্যমে নাটকের চরিত্রের চারিত্রিক অভিব্যক্তি প্রকাশে পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সাধারণত কুয়াশার এক সূক্ষ্ম আবরণে হেমন্ত ঋতুকে নাট্যকার প্রকৃতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে, হেমন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে ক্ষেত

শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ঋতুতেই কৃষিজীবীরা নতুন শস্য ঘরে তুলে 'ন-গোরা' উৎসব পালন করে। পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'-য় হেমন্ত ঋতুর আগমনের বন্দনাসূচক এই দুটি গানের মাধ্যমে হেমন্ত ঋতুর চারিত্রিক ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী'-তে
"কুঁওলী ওরণি খনি লৈ
লখিমী আহিছে চোয়া হেরা:
শইচেরে হাঁহিছে ধরণী
লখিমীর জয়গান করা"[১৩]

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'-য়
"হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা" [১৪]

পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার 'লখিমী' গীতিনাট্যের অন্তর্গত। নাটকটির প্রতিটি চরিত্রই প্রকৃতির উপাদান। প্রকৃতির এই চরিত্রগুলি নাটকটিতে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে নাট্যবিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার 'লখিমী'-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'বসন্ত', 'শেষবর্ষণ', 'নবীন', 'শ্রাবণগাথা', 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' প্রভৃতি নাটকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় নাট্যকারই উল্লিখিত নাটকগুলি প্রকৃতির ঋতু-উৎসবকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। নাটকগুলি প্রকৃতিকেন্দ্রিক। ফলে, পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ সংসারের গতিচক্রের এক গভীর তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। সুতরাং পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার 'লখিমী'-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত নাটকগুলির বিষয়বস্তু, উপস্থাপনশৈলী, প্রকৃতির মাধ্যমে গভীর তত্ত্বের প্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসা পার্বতীপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যাভিনয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণের ফলেই তাঁর নাটকগুলি রবীন্দ্রনাটকের মতোই রচিত। তাই প্রকৃতির ঋতু-উৎসবকে নাট্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শরতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তাঁদের রচনায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পাওয়া শরত নারীমূর্তি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী'-তে শরৎ যেমন কলাবিশারদ চিত্রলেখা রূপে ধরা দিয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'শেষবর্ষণ'-এ শরত হয়ে উঠেছে শরৎলক্ষ্মী অথবা শরৎপ্রতিমা। সুতরাং প্রকৃতিকে মানবীয় রূপে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্বতীপ্রসাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সাত

'লখিমী' নাটকটি গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। গানকে প্রাধান্য দেওয়া এই নাটকটিকে নাট্যকার নিজে একটি 'গীতিনাট' হিসেবে অভিহিত করেছেন। নাটকটিতে মোট ৭টি গান এবং ৪টি নৃত্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পার্বতপ্রসাদের 'লখিমী'-র সঙ্গে গীতিনাট্যশৈলীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিকেন্দ্রিক ঋতুনাটকগুলির সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঋতু-উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত উভয় নাট্যকারের নাটকের নাট্যচরিত্র সমূহই প্রকৃতির উপাদান। 'লখিমী'-তে শরতের বিদায়ের সময় সমাগত হওয়ায় শেফালির হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। কারণ শেফালির এখনও অনেক কলি ফুটতে বাকি আছে। শরৎ চলে গেলে শেফালির ফুটতে থাকা বাকি ফুলগুলি অর্ধেক অবস্থায় মরে যাবে। শেফালির মনের এই দুঃখে ভাব গানের মাধ্যমে প্রকাশিত

"এতিয়াও মোর বহুত কলি
তোমাকে চাই নয়ন মেলি
এতিয়াও নৌ সামরিব
শেষ হোয়া নাই রং"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটকে বসন্তের বিদায়ের ক্ষণে বকুলের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। কারণ বকুলের ফুলগুলির এখনও ফোটা শেষ হয়নি। বসন্ত চলে যেতে উদ্যত হওয়ায় বকুলের এই বেদনা ঝুমকো লতা গানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে —

"আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয়নি সারা,
সাজি ভরেনি",[১৬]

আট

পার্বতীপ্রসাদের 'লখিমী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'-য় উপস্থাপিত হেমন্ত ঋতু হলো সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক। কারণ হেমন্ত ঋতুতে কৃষকের মাঠে লখিমী সোনালি রূপ ধারণ করে। কৃষক সন্তানরা মাঠের সোনার শস্য ঘরে নিয়ে আসে। লখিমীর আগমনে কৃষকের ঘরে সুখ ও আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। পার্বতীপ্রসাদের লখিমী-তে থাকা বস্তি চরিত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত নাটকে থাকা দীপশিখা চরিত্রটির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় চরিত্রের মধ্যেই রূপকধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে। নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলোর পথ দেখানো বস্তি এবং দীপশিখা প্রকৃতি জগৎ ও কৃষক সন্তানদের জন্য হয়ে উঠেছে দুঃখের প্রদীপ তথা আশার সম্বল। লখিমী-তে বস্তি যেভাবে কৃষক সন্তানদের দুঃখের প্রদীপ হয়ে তাদের জীবনের পথকে

এগিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-এ বসন্ত ঋতুর বিদায়ের ক্ষণে জেগে পড়া প্রকৃতিজগৎকে দীপশিখা সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে। সুতরাং রূপকধর্মিতার মাধ্যমে চরিত্রগুলির বাহ্যিক রূপের অন্তরালে নিহিত অন্য একটি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে পার্বতীপ্রসাদের লখিমী নাটকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পার্বতীপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্রেই মগ্ন ছিলেন না। তাঁরা প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত রহস্যেরও সন্ধান করেছিলেন। পার্বতিপ্রসাদের লখিমী-তে শরত ও হেমন্ত ঋতুর আগমন এবং প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সৃষ্টির গতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। সংসারের গতিচক্রে সকলের জীবনই ক্ষণস্থায়ী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই আমাদের নতুনকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। সংসারের গতিতত্ত্বের এই ভাবধারাকেই প্রকৃতির ঋতুচক্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে লখিমী-তে প্রকাশ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে জ্ঞান আহরণের মূল মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শারদোৎসব, ফাল্গুনী, বসন্ত, শেষবর্ষণ প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকগুলির মাধ্যমে প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সংসারের কিছুগভীর তত্ত্বও প্রকাশ পেয়েছে। শরৎ ঋতুকে কেন্দ্র করে রচিত শারদোৎসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে জগতের ঋণ পরিশোধের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ফাল্গুনী-তে জরা, বার্ধক্য, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লাভ করা মানবজীবনের রূপান্তরিত গতিতত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। বসন্ত নাটকের মূল বাণী হলো রিক্ততার মধ্য দিয়েই পূর্ণতা সার্থকতা লাভ করে। তদপুরি ফাল্গুনী, বসন্ত, শেষবর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সৃষ্টির গতিতত্ত্বও উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতিকে রূপকধর্মী রূপে উপস্থাপন করে তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা গভীর তত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে পার্বতীপ্রসাদে লখিমী নাটকের সমরূপতা লক্ষ্য করা যায়।

নয়া

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সাহিত্যচেতনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করলেও পার্বতীপ্রসাদ কেবল অনুকরণের পথে অগ্রসর হননি; বরং অসমের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোকজ উপাদান এবং সামাজিক বাস্তবতাকে অবলম্বন করে এক স্বতন্ত্র নাট্যভাষা নির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর গীতি নাট্যগুলি রবীন্দ্র-ভাবনার সম্প্রসারণ যেমন, তেমনি অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির নিজস্ব সৃজনশীল পরিচয়েরও উজ্জ্বল নিদর্শন। অতএব, এই আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, উভয় নাট্যকারের গীতিনাট্যে বিষয়বস্তু, রূপক প্রতীকের প্রয়োগ, প্রকৃতিচেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যেকের সৃষ্টিতে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। এই সাদৃশ্য কোনো অনুসরণের পরিচয়ক নয়; বরং এক সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের সৃজনশীল

রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পার্বতীপ্রসাদের শিল্পসত্তাকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু তাঁর মৌলিক সৃষ্টিশীলতাকে আচ্ছন্ন করেনি। সুতরাং, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার গীতিনাট্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন কেবল দুই সাহিত্যিকের পারস্পরিক সম্পর্ক বা প্রভাবের মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাংলা ও অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক, সাংস্কৃতিক অদান-প্রদান এবং আধুনিক ভারতীয় গীতিনাট্যের বিকাশধারাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবনের সুযোগ করে দেয় এবং এই গবেষণা ভবিষ্যতে বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্য-তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), সোণর সোলেঙ,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ. ২৬৫

২। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), সোণর সোলেঙ,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৪৯

৩। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), সোণর সোলেঙ,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৫০

৪। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), সোণর সোলেঙ,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৪৭

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড) রাজা,কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ ২৪৯

৬। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), সোণর সোলেঙ,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৬৭

৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড) রাজা,কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬৭৫

৮। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), সোণর সোলেঙ,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৬৬

৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড) রাজা, কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬৪৮

১০। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), লখিমী,অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৩৫

১১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড) রাজা,কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৫৩

১২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীনসাহিত্য, শকুন্তলা, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ৪৪-৪৫

১৩। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), লখিমী, অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ.২৩৯

১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র, ২য় খণ্ড, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩,পৃ. ৩১৫

১৫। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ), লখিমী, অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১, পৃ. ২৩৭

১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড) বসন্ত, কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৪

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(ক) মুখ্য গ্রন্থপঞ্জী

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩।
২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড) কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, ২০০৩।
৩। বরুয়া পার্বতীপ্রসাদ (সম্পাঃ শর্মাপবনাথ),অসম সাহিত্যসভা, যোরহাট, অসম, ১৯৮১।

(খ) গৌণগ্রন্থপঞ্জী

১। কলিতা, রঞ্জন, সম্পাদক। গীতিকবি পার্বতীপ্রসাদ: জীবন ও সৃষ্টির মূল্যায়ন। গীতিকবি পার্বতীপ্রসাদ বড়ুয়া জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, ২০০৪।
২। কোওঁর, চরণ। অসমীয়া সাহিত্যত রবীন্দ্রিক প্রভাব। অসমীয়া বিভাগ, গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭। অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র।
৩। দাসগুপ্ত, শান্তিকুমার। রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য। ভারতী প্রকাশন, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।
৪। ভট্টাচার্য, উষা রঞ্জন। নীল সোনালির বাণী: রবীন্দ্র-অসম সম্পর্ক। ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, প্যাপিরাস, ২০১০।

Writer : **Reshmi Bir,** Research Scholar, Department of Bengali, Guwahati University, Assam.

মনন ও অনুভবে

সম্পাদনা
শংকর কর

রবীন্দ্রসংগীত : মননে ও অনুভবে

মুখ্য উপদেষ্টা
অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য

উপদেষ্টা
অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী

সম্পাদনা
শংকর কর

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

RABINDRASANGEET : MANANE O ANUBHABE
A collection of theoretical, analytical and descriptive articles on Rabindra Sangeet in Bengali and English Edited by Sankar Kar, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata-700009, January : 2022 ₹ 800.00

© লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২২

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
স্টার লাইন
কলকাতা : ৭০০০০৬

ISBN : 978-93-90993-57-4

মূল্য : আটশো টাকা

সংগীত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা : 'বিসর্জন' ৩২০ অজিত কুমার সিংহ
'গীতাঞ্জলি' কাব্যের রাজবংশী অনুবাদ :
কথায় ভাবে ছন্দে গানে ৩২৬ পবিত্র রায়
রবীন্দ্রনাথের গানে কাব্যভাবনা : প্রসঙ্গ 'গীতাঞ্জলি' ৩৪২ প্রণয় ব্রহ্মচারী
রবীন্দ্রসংগীতে অষ্টনায়িকা : (উজ্জ্বলনীলমণি) প্রসঙ্গ ৩৫৫ শেলী দত্ত
'গীতাঞ্জলি' এবং 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ :
একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন ৩৬৮ কুমার বিষ্ণু দে
রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ৩৭৯ প্রেমানন্দ রায়
রবীন্দ্রগানে ঋতু বৈচিত্র্য : বিশ্লেষণের দর্পণে ৩৮৫ বর্ণশ্রী বক্সী
রবীন্দ্রসংগীতে মানবীয় আধ্যাত্মিকতা : দার্শনিক
দৃষ্টিতে একটি বিশ্লেষণী পাঠ ৩৯৬ সুব্রত রায়
রবীন্দ্রগানে সন্ধ্যার বহুমাত্রা ৪১২ কৃষ্ণকান্ত রায়
প্রকৃতি-তত্ত্ব ও রবীন্দ্রসংগীত ৪২১ সঞ্জয় চন্দ্র দাস
রবীন্দ্রসংগীতে পরিবেশ ভাবনা ৪৩৪ চৈতালী ভৌমিক
রোমান্টিকতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ৪৪০ সঞ্জয় সরকার
রবীন্দ্র নাটকে সংগীত : প্রসঙ্গ 'রক্তকরবী' ৪৪৮ নারায়ণ দত্ত
রবীন্দ্রসংগীত : লোকায়ত থেকে লোকোত্তরে যাত্রা ৪৫৩ আব্দুল জলীল চৌধুরী
"ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' : বৈষ্ণব
অলংকার শাস্ত্রের আলোকে" ৪৬৩ অনিন্দিতা সাহা
রবীন্দ্রসংগীতে বাংলা টপ্পা গানের প্রভাব ৪৭৬ প্রভাকর মণ্ডল
'রাজা' : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রগান ৪৮১ সুব্রতা মজুমদার
রবীন্দ্রনাথের গান : বিশ্বসংগীতের এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ৪৮৫ মাধব ঘোষ
রবীন্দ্রসংগীতে বৈষ্ণবীয় গরিমা ৪৯২ রেশ্মী বীর
রবীন্দ্রগান : লোকঐতিহ্যের সন্ধানে ৪৯৯ পঙ্কজ দাস
বিজ্ঞানচেতনায় রবীন্দ্রসংগীত ৫০৬ সংগীতা নন্দী
রবীন্দ্রগানে—অন্তিম শ্বাস পরমের প্রকাশ ৫১১ পরিমল বসাক
রবীন্দ্রনাথের গান : পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদের দৃষ্টিতে ৫১৮ মধুরিমা কর
রবীন্দ্রনাথের গান ও আধুনিক প্রবণতা ৫২৬ সৈকত বালা
রবীন্দ্রসংগীতে সাম্রাজ্যবিরোধী বিকল্প
আধুনিকতা : একটি অনুসন্ধান ৫৩১ শতাব্দী কর
'দুই বিঘা জমি' ও রবীন্দ্রগান ৫৩৭ বিষ্ণুদীপ চক্রবর্তী
রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিফলিত মৃত্যুচেতনা ৫৪১ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রগানে ভাটিয়ালি সুর : স্বদেশ-ভাবনার আলোকে ৫৪৬ অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীতে বৈষ্ণবীয় গরিমা

রেশ্মী বীর

জগতের সাহিত্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে বিচিত্রধরণের পরিবর্তন মানুষের জীবনকে চিরনতুন করে তুলছে। যুগান্তরের এই বৃহৎ ইতিহাস "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"— বন্ধনে আবদ্ধ। ভারত জন্মসূত্রে ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ। কালে-কালে এই দেশ নানান মহান উৎকর্ষ, মহান পুরুষদের আগমনে চিরসুন্দর রূপে লালিত হয়ে চলছে। তবে এই দেশে জগৎকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যেন কতকটা আকাশ থেকে খসে পড়া নক্ষত্র বিশেষ। যাঁর স্বনামধন্য জীবন চিরনমস্য। সাহিত্য, দর্শন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে তাঁর অবদান অতুলনীয়।। জীবনবোধ ও সমগ্রতার সুরে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, পদাবলি সাহিত্য অথবা শাক্তের আত্মিকতা। তাই রবীন্দ্রসংগীতে আমরা খুঁজে পাই করুণাধারার গীত-সুধারস। সে সুধারসে রয়েছে ঈশ্বরোপসনার এক পারমার্থিক সত্য।

একদা সর্বভারতীয় স্তরে 'ভক্তি আন্দোলন' নামে যে জাতীয় নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল তার মূলে ছিল যে আদর্শ সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে স্বনামধন্য অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী 'The Heritage' গবেষণা পত্রিকায় অন্তর্গত তাঁর 'সমাজ সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান প্রবন্ধে বলেছেন, 'সত্য, নীতি, কল্যাণ, সৌন্দর্যস্পৃহাকে অবলম্বন করে ধর্মীয় আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যুগসঞ্চিত ভাষা-বর্ণ ও অর্থহীন ধর্মীয় আচারের সমস্তরকম আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করা।" শঙ্করাচার্যের মত ছিল—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগতের সমগ্রতাকে অস্বীকার করে নেওয়ার তাঁর নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতবর্ষের জন-মানসে নানা ধরণের সাম্প্রদায়িক অনাচার-অবিচার, ধর্মীয় চেতনায় মানুষের বিদ্রুপতা, আর্থ-সামাজিক পর্যবেক্ষণে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মারাত্মক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংকীর্ণতায় বৈশ্য-শূদ্রদের প্রতি অবহেলিত ধারণায় মানবতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঈশ্বরসেবাকে অচলায়তনের কক্ষে বন্দি করা হয়। ফলে ভারতভূমিতে অমৃতস্য পুত্রের ন্যায় আবির্ভাব ঘটে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, শংকরদেব, রামানুজ, রামানন্দ, মীরবাঈ প্রমুখ। আধ্যাত্মিক শক্তির আরাধনায় প্রেমতত্ত্বকে মূল্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, নির্বিশেষে ভারতবর্ষে এক অভিনব পন্থায় বৈষ্ণবধর্মের সূচনা। আজ রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের মাহাত্ম্যও সকলের আরাধ্য বিষয়। এই বৈষ্ণবীয় পন্থার প্রবল আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসিকতার চিরসুন্দর বাণী, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—উচ্চারিত হয়। প্রেম পবিত্র, নির্মল। দেবতা ও প্রিয়জন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্"। যে ফুল প্রেমিকযুগল পরস্পরকে নিবেদন করে,

সেই ফুল দিয়েই ভক্তের দ্বারা ভগবান আরাধিত। এই নিবেদনের ঐশ্বর্যকে সংগীত তার আপন সৌকুমার্যে লালিত করে তোলে। কবির বিশ্বাস ছিল, "যাহাকে ভালোবাসি কেবল তাহার মধ্যেই আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করাই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।"[১]

'গীতাঞ্জলি'র একটি গানে সংগীতস্রষ্টা রবির করকমলে এই সাধনার শ্রেষ্ঠ নিবেদন—

"অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।" (গী.বি.পূজা, সং ৬৫)

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাত্মা রাধারানির প্রণয়লীলা যে আধ্যাত্মিক পথে প্রেমের পরাকাষ্ঠা স্থাপিত হয়েছে তারই পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব পদাবলি কিংবা বৈষ্ণবীয় গীতগুলিতে। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্থাপনে মধ্যযুগে বৈষ্ণবীয় পদকর্তারা আকুল-সুরে প্রেমসারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে গেছেন, তারই যথাযথ প্রেমসৌন্দর্যের মধুরতম উচ্ছ্বসিত সুধারস রবীন্দ্রসংগীতে বিরাজমান। সংগীত মুক্ত, অসীমের সঙ্গে যুক্ত। তাই রবীন্দ্রসংগীতে শোনা যায় অভ্রভেদী আবাহন—

"এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে।" (ঐ, সং ১২)।

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে মানবসত্তাই মুখ্য এবং তারই আধারে বৈষ্ণব-কবিরা চিরন্তন হৃদয়ে রাধা-কৃষ্ণের পরমলীলা আস্বাদন করেছেন— তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই দর্শনজাত ভাবনাই গৃহবন্দি রবির কণ্ঠে মুক্তির অভিসারের সুর ধ্বনিত এভাবে—

"ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল..."(প্রকৃতি, সং ১৯৭)

তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রাধাভাবদ্যুতি শ্রীচৈতন্যের মানসবেদনা। পুরীর নীলসমুদ্রকে কৃষ্ণস্বরূপ ভেবে তার মধ্যে চৈতন্যের মনোনিবেদন, সেই অনুরূপ প্রেমলাভের নিমিত্ত আরাধনা তাঁর সংগীতে লক্ষ করা যায়। কবি কণ্ঠে শোনা যায়—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব'। (রাজা) অথবা
"আরো আরো, প্রভু, আরো আরো এমনি ক'রে আমায় মারো।' (ঐ,পূজা,সং ২২৮)

যুগের পর যুগ ধরে বৈষ্ণব পদের বাচ্যাতিরিক্ত রসব্যঞ্জনা মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে চলছে। রবীন্দ্রনাথ সেই গানগুলিকে রসের অসীম আনন্দদানে এক ব্যতিক্রমী মনো-বাসনার পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করেছেন। এই প্রাপ্তির প্রত্যাশা অনেকটা যেন, 'A Thing of beauty is a joy forever'।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমই শুধু নয়, তাঁদের অনন্তকালের বিরহবেদনায় উৎসর্গিত বৈষ্ণব

গীতগুলি নিসর্গ সন্দর্শনের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ এই বিরহকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করেছেন। মা সারদাদেবীর মৃত্যু, প্রিয় বউঠাকুরানীর আত্মহত্যা, তাঁকে মৃত্যুর হাতে নিরুপায় করে তুলেনি বরং বিরহের তীক্ষ্ণ দাহে তিনি সঞ্চার করেছেন আত্মদানের উৎসধারা—

"গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে—
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা।।
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে" (বিচিত্র, সং ৮৪)

এই বিরহজ্বালা বৈষ্ণবকবি রবীন্দ্রচিত্তকেও তত্ত্বাভিজ্ঞ করে তোলে। তিনি অনুভব করেছিলেন রাধার আত্মবিশ্বাসকে। সেই বিশ্বাসের ছোঁয়ায় Inspiration তাঁর সংগীত-সাধনাকে রসানুভূতির সুরে রূপদান করেছে। তত্ত্ববহুল তাঁর লেখাগুলিতে কখনও যেন চঞ্চল চৈতন্যের প্রভাব দেখা যায়। চৈতন্যদেব যিনি বাল্যকালে ছিলেন অত্যন্ত অশান্ত স্বভাবের বালক। কিন্তু সময়ের স্রোতে তাঁর এই অস্থির মেজাজ শাশ্বত বিরহকে কীভাবে আলিঙ্গন করে, তাঁরও শিল্পসম্মত সুর রবীন্দ্রসংগীতের কুশলী নির্মাণে প্রতিষ্ঠিত—

"তুমি মোর আনন্দ হয়ে, ছিলে আমার খেলায়—
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়" (পূজা, সং ৫০)

রবীন্দ্রনাথের বালক মনও ছিল চঞ্চল, "ইস্কুল-ঘরের বাইরে যে আকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল"[২] এই চঞ্চলতার বশে তাঁকে কেউ কোনোদিনই বেঁধে রাখতে পারেননি। বরং সকল সীমার বন্ধনকে উপেক্ষা করে তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক সত্তার পূর্ণবিকাশ ঘটেছে—

"নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই— আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।" (বিচিত্র, সং ৭৬)

তাঁর আত্মসত্তার গহীন তপোবনে নিরন্তর চলেছে প্রেমোচ্ছ্বাসের বাণী। বিশ্ব প্রেমবোধ তাঁর নিজস্বতাকে সর্বদা তলিয়ে দেখেছে। তিনি 'মেঘদূত' প্রবন্ধে মানবমনের যে অনন্ত বিরহ তার কথা বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আমাদের মানস সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে।" এই বিরহই বৈষ্ণব পদকর্তাদের মাথুর পদে ধ্বনিত, যথা বড়ু চণ্ডীদাসের—

"এত সব সহিলোঁ মো
কাহ্নের নেহাত লাগি বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞির পাশে"—(বৈষ্ণব পদাবলী তত্ত্ব ও কাব্যে)

আবার, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"রাধিকার অতি অন্তর বেদন কে বুঝবে অয়ি সজনী।

কে বুঝবে, সখি, রোয়ত রাধা কোন দুখে দিনরজনী?" (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, সং ১৪)

বেদনার নিভৃত মননের দ্বারা তিনি অনুভব করেছেন রাধার অঝরা অশ্রুনীর। যেখানে কৃষ্ণের শ্রুত বাঁশির শব্দ হৃদয়ে বিদ্যুৎ উদ্ভাসের ন্যায় বেদনার আমন্ত্রণ বাণী লিখে যায়—

"বাঁধনহারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে ব'লে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিনীর কুঞ্জবনে।" (প্রকৃতি, সং ৬৫)

প্রেমে মানুষ আত্মভোলা পথিক। যেখানে কামনার জন্য দ্বার রুদ্ধ। আছে শুধু নির্মল, স্বচ্ছল ভালোবাসার দাহিকা শক্তি। তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনী ও শচীনের প্রেমতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা উপলব্ধি করি সেটা যেন আনন্দবিরহের অন্তর্দাহে কল্যাণের শুভ্রদীপ্তির প্রেম। শচীনের সন্ন্যাসীমন, দামিনী তাঁর সাধনপথে কণ্টক উদগীর্ণ না করে, শ্রীবিলাসের লাবণ্য-অমিতর প্রেমকে স্বীকার করে নেওয়ায়, তিনটি জীবনের গতিবেগে যে শান্তির বার্তা বয়ে এনেছিল তাতে তীব্র দেহাশ্রয়ী ভাবের কোনো উপস্থিতি ছিল না। এই বিশুদ্ধ প্রেমের পরিপূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।" (নিষ্ফল কামনা, মানসী)

আমরা বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদে ব্যথিত রাধার পিরিতি দেখতে পাই। যেখানে রাধার শত দ্বন্দ্বেও জাগে কানুর প্রতি সংক্ষিপ্ত ভীতিবোধ—

"না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে"

এখানে রবির প্রাণসত্তা কতকটা যেন রাধারই সমতুল্য—

"মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে।"
(গী.বি, প্রেম, সং ২৫১)

বর্ষাভিসারে গোবিন্দদাসের রাধা নিদারুণ প্রকৃতিকে জয় করে চলেছেন—

"গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।"[৩]

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠিত, থর হর কম্পিত দেহ
ঘন ঘন রিমঝিম্ রিমঝিম্ রিমঝিম্ বরখত নীরদপুঞ্জ।"
(প্রকৃতি, সং ৩১)

শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য পর্যায়ের গোষ্ঠলীলায় বাসুদেব ঘোষ লিখেছেন—

"গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।" (বৈষ্ণব পদাবলী ভাব ও কাব্যে)

অপরদিকে, একই পরিবেশ-সংলগ্ন গোষ্ঠভাবনায় রাবীন্দ্রিক সুর শোনা যায়—

"হোরো গো প্রভাত হল, সুয্যি ওঠে, ফুল ফুটেছে বনে।
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব আজ করেছি মনে"।

(বিচিত্র, সং ৮৮)

নিখিলেশ্বরের প্রতি তাঁর মন কুহেলিকা ভেদ করে প্রকাশের মতো উদঘাটিত হয়। তাই তিনি তাঁকে বন্দনা করেছেন "শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।" তাঁর এই বন্দনা বৈষ্ণবদের মতোই ভগবৎ প্রেমের আত্মসমর্পণের পদে ব্যক্ত—

"ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে।" (পূজা, সং ২৩১)

'প্রেম যে স্বভাববৈরাগী। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো' (ঘরে-বাইরে) এই শিষ্ট মনোভাব তাঁর জাগতিক তৃষ্ণাকে দমন করতে পেরেছিল। ফলস্বরূপ তিনি মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবকেও নির্ভয়ে উচ্চারণ করেন—

'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে' (ঐ)— কিংবা,
মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান।'
"মৃত্যু-অমৃত করে দান। (প্রেম, সং ১৮১)

তাঁর চিত্ত বহন করে শ্যামের অনন্ত নিখিল রূপ। কালোকে তিনি দেখেছেন রূপের অপরূপে। তাই 'রাজা' নাটকে রানি সুদর্শনার কণ্ঠে বলিয়েছেন, "তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, অনুপম।' তা-ই গানের কলিতে শোনা যায়—

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গায়ের লোক।" (বিচিত্র, সং ৭৫)

শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ জন্মে, তাহাও অলৌকিকত্ব, অপ্রাকৃত্ব এবং চিন্ময়ত্ব লাভ করে। ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত প্রাকৃত দ্রব্যও যে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে— যেমন মহাপ্রসাদাদি, ইহা অতি প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসম্মত।"[৪]

তাঁর এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথকে 'আধুনিকী ভক্তিবাসনা'-র ভক্তরূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কেননা 'পুরুষযোগ্যতা'-র বিষয় আলোকপাতে আচার্য রাধাগোবিন্দনাথ বলেছেন, 'আধুনিকী এবং প্রাক্তনী' বাসনাই হইতেছে রসাস্বাদনের হেতু'। এই ভক্তি সাধনার বিশুদ্ধচিত্তে ভক্তের আবির্ভাবে ভগবানের প্রকাশ দিব্য-অম্লান-শান্ত-প্রশান্তিতে। তাই বৈষ্ণব গানের সুরে যদি প্রাণস্পন্দনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তবে রবীন্দ্রসংগীত বৈষ্ণব সরোবরের নিত্যস্নাতক। সংসারে দুঃখ, আঘাত, বেদনার একটি

বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। বৈষ্ণবসংগীত তারই দূতী। রবি নিজেও বলেছেন,—"আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে।" বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে তিনি সেতু তৈরি করেছেন ঈশ্বরকে কাছে পেতে। তারই পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বাদ পেতে মুক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে বহুকাল। শেষে তিনি প্রেমের মধ্যে মুক্তির সাধনা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন পরিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অপরিসীম প্রেমের মিলনসাধনাকে। তাঁর অন্তরের এই রহস্যের বাঁধ ভাঙতে দেখা যায় 'মুক্তধারা'-র অভিজিৎকে। যেখানে ঈশ্বর ও প্রকৃতি একাকার হয়েছেন নির্লোভ সাধনায়। তাঁর এই কঠিন চিন্তার জোর ভারতবর্ষের সাধনচিত্তে শংকরাচার্যের শূন্যরূপ ব্রহ্মবাদকে সাধনক্ষেত্রে প্রশ্রয় না দিয়ে মানুষকে পরিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রচারিত করতে সক্ষম হয়। শিল্পচেতনার এই মাধুর্য বিনোদনে রবীন্দ্রনাথ ১৩১০ অগ্রহায়ণ 'বঙ্গদর্শনে' ঘোষণা করেছিলেন, 'চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ'। বৈষ্ণব পদাবলির মতো তাঁর গানের বিশুদ্ধ লিরিক মনোবনে শ্রবণালোকে কৃষ্ণচূড়ার কর্ণমঞ্জরি। "যাঁর অন্তে শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলিবে।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আজ যাঁরা আমার রচনাকে স্থায়ী সম্মানের রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা আপনার রুচি ও সংস্কৃতি অনুসারে তার স্থায়ীত্ব উপলব্ধি করেছেন, মানুষ আপনার এই উপলব্ধিকে বিশ্বাস করে পাকা ইমারতের কাজ ফাঁদে, ভুল হতে পারে কিন্তু ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাকে মানুষ যে আস্থা করে সেই আস্থারই মূল্য বেশি"[৫]— এই উক্তির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে আলোচনার পরিসমাপ্তি করলাম।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মনুষ্য, পঞ্চভূত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩০৪, পৃ. ৫৪
২. তদেব : রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড (কবিতা), (অবতরণিকা অংশ), ১ম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৪৬
৩. দীপঙ্কর মল্লিক : বৈষ্ণব পদাবলী : তত্ত্বে ও কাব্যে, অভিসারানুরাগ, (গোবিন্দ দাস), দিয়া পাবলিকেশন, ২০১২, পৃ. ২৩২
৪. শ্রী রাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন', ৫ম খণ্ড, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ৭ম পর্ব, রসতত্ত্ব, প্রাচ্যবাণী মন্দির, কল, ১৩৬১, পৃ. ৩০৯৩
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা অংশ, বিশ্বভারতী, ১ম সং, ১৩৪৬

সহায়ক পঞ্জি

১. অমলেন্দু চক্রবর্তী; পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা, সমাজ সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান।
উৎস—www.ramanathbhattacharyafoundation.org (pdf)

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কবিতা। প্রকাশক—শিক্ষাসচিব পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আষাঢ় ১৩২৭, জুলাই ১৯৮০
৩. সুনির্বাচিত রবীন্দ্র সংগীত, সর্বকালের সেরা বাছাই করা ২৬০টি গান। সন্ধ্যা প্রকাশনী, ২০০২।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভানুসিংহের পদাবলী
৫. শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, সপ্তম পর্ব-রসতত্ত্ব। প্রকাশক—প্রাচ্যবাণী মন্দির, কলি।
৬. দীপঙ্কর মল্লিক, বৈষ্ণব পর্দাবলী তত্ত্ব ও কাব্যে, প্রকাশক—দিয়া পাবলিকেশন (ভারত)

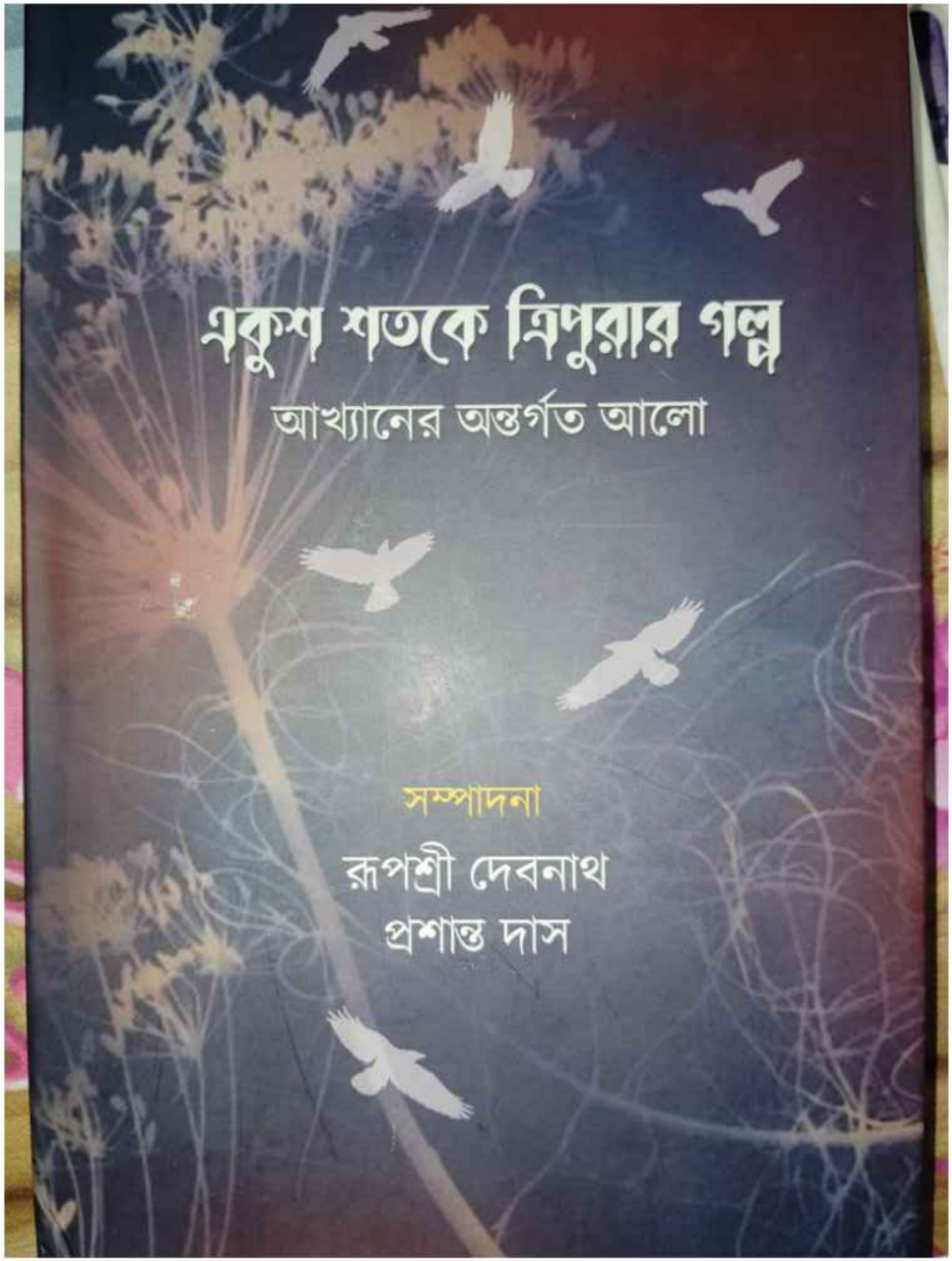
একুশ শতকে ত্রিপুরার গল্প
আখ্যানের অন্তর্গত আলো
সম্পাদনা
রূপশ্রী দেবনাথ
প্রশান্ত দাস

Ekush Shatake Tripurar Galpa : Akhyaner Antargata Alo
Shortstories of Tripura in the Twenty First Century :
The Inner Light of Narratives
(A collection of Research Articles on Bengali Short Stories of Tripura)
Edited by
Rupasree Debnath & Prasanta Das

ISBN : 978-81-687936-0-6
First Imprint : 1st July, 2026

প্রথম প্রকাশ : ১ জুলাই, ২০২৬

প্রকাশক : পরিমল দাস
যোগাযোগ : পরিমল পাবলিশার্স
মানিকভাণ্ডার, কমলপুর
ধলাই ত্রিপুরা ৭৯৯২৮৭
ফোন : ৯৮৬৩৪৯৬১৭৯
ইমেইল : dprasanta1985@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : প্রশান্ত দাস

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

বর্ণ সংস্থাপন : রূপশ্রী দেবনাথ

মুদ্রণ : আল্‌ফাবিটা ইম্প্রেশন
মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৪২

বিনিময় মূল্য : ৩৫০ টাকা

সূচি

অভিজিৎ চক্রবর্তীর গল্প : মনস্তত্ত্বের মেধাবী বিচ্ছুরণ
চিরশ্রী দেবনাথ ৯

গল্পচর্চার ধারার সমানুপাতিক বিচারে একবিংশ শতাব্দীর কথাকার অরিন্দম নাথ
গৌরব নাথ ১৭

গৌরী বর্মনের গল্পে সমাজের অদেখা ছবি : প্রসঙ্গ 'এখনো অনেক গল্প বলা বাকি'
পদ্মশ্রী মজুমদার ৩৩

নির্মল দাশের ছোটগল্প : সময় ও সমাজ অন্বেষণ
রূপশ্রী দেবনাথ ৪৩

সময়ের অভিঘাতে জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি : প্রসঙ্গ গল্পকার শ্যামল বৈদ্য
রেশ্মী বীর ৫৪

সিক্তা চক্রবর্তীর ছোটগল্প : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
ঋতুপর্ণা পাল ৬৫

জয়া গোয়ালার ছোটগল্প : প্রান্তিক জীবনবোধের অভিলেখ
দীপান্বিতা আচার্য ৭৬

সুনন্দা ভট্টাচার্যের 'পুবদুয়ারি' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
স্নেহাশীষ রায় ৮৫

উপজাতি জীবন নিরীক্ষণের প্রভায় হরিভূষণ পালের ছোটগল্প :
পুনঃপাঠের অভিজ্ঞতা
ড. হুমায়ুন কবীর ১০৫

গল্পকার কিশোর রঞ্জন দে : জীবনের নোনাজলে মিশে থাকা গল্পের অবয়ব
শান্তনু ভট্টাচার্য ১১২

সুখী সমাপ্তির অন্বেষা : মাধুরী লোধের ছোটগল্পের বিকল্প পাঠ
দীপান্বিতা আচার্য ১২৩

গল্প নয় জীবনের ছবি :
প্রসঙ্গ সত্যজিৎ দত্তের 'সিনেমা হলের মন্দ মেয়ে ও অন্যান্য গল্প'
দিল্পি দে ১৩০

শঙ্খশুভ্র দেববর্মণের ছোটোগল্প : একটি পর্যালোচনা
ড. মিষ্টু রায় ১৩৪

চিরশ্রী দেবনাথের গল্পবিশ্ব : পাঠকের দৃষ্টিতে
অনিন্দিতা চক্রবর্তী ১৪০

পদ্মশ্রী মজুমদারের গল্পভুবন
ড. রূপশ্রী দেবনাথ ১৪৩

শ্যামল ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের আন্তঃসম্পর্ক :
একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
রেশ্মী বীর ১৫৪

মঞ্জু দাসের গল্পে সম্প্রীতি চেতনা
ড. প্রশান্ত দাস ১৭৪

প্রাবন্ধিক পরিচিতি ১৮৪

সময়ের অভিঘাতে জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি : প্রসঙ্গ গল্পকার শ্যামল বৈদ্য

রেশ্মী বীর

শ্যামল বৈদ্য ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারার এক পরিচিত নাম। ১৯৬৭ সালের ১৬ নভেম্বর ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত কমলপুর মহকুমায় লেখকের জন্ম। পেশায় তিনি ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হলেও কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে একজন সব্যসাচী লেখকরূপে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করছেন। এই প্রতিভাবান লেখকের বেশকিছু গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বুনো গাঙের চর', 'ইতরবিম্ব' উপন্যাস, 'পরাপর', 'জংলি বিছে', গল্পগ্রন্থ 'জীবন নিয়ে নাটক', 'পত্তুগাঁয়ের গল্প' নাট্য সংকলন ও 'দাগ নেই', 'শস্যক্ষেতে আলোর শরীর', 'নির্বাসিত ভূমিপুত্র', 'ভোর পালিয়েছে পুবের আকাশে' কাব্যগ্রন্থ পাঠক মহলে সমাদৃত। 'পরাপর' নাটকের জন্য তাঁকে ২০১৫ সালে ত্রিপুরা সরকারের 'সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়। 'অবয়ব' নাটকের জন্য পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ থিয়েটার কর্তৃক 'কলিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার'। এছাড়াও পেয়েছেন ত্রিপুরার 'স্রোত' পত্রিকা ও প্রকাশনাগোষ্ঠী থেকে 'দক্ষিণারঞ্জনধর স্মৃতি স্রোত পুরস্কার'।

বলাবাহুল্য, উত্তর-পূর্বের এমন অনেক লেখক বহুদিন ধরে লিখে আসছেন। তাঁরা লিখেন প্রকৃত অর্থে লেখার উদ্দেশ্যেই। সেগুলি নিয়ে প্রচার করার উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের লেখকদের মধ্যে নিতান্ত কম। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে যে সমস্ত ঘটনা তাঁরা দেখেন সেগুলিকেই আপন ছন্দ-সুর ও ভাবনায় ফুটিয়ে তুলেন। শ্যামল বৈদ্যের ছোটগল্প সেই ভাবনারই প্রতিবিম্ব। একজন দায়িত্বশীল, প্রতিভাবান লেখক যাঁর গল্পভুবনের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানবজীবন ও মানব-মন। যাঁর গল্পের অনুভবে রয়েছে দৈনন্দিন পরিবেশের নিত্য ক্রিয়াকলাপ। তিনি আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে মানব মনের অসারতা কীভাবে সমাজকে প্রতিনিয়ত দংশন করে চলছে সেসব বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত পৃথিবীর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, 'একদিন শুধু ভালোবাসাই হবে জীবনের মাপকাঠি।'

'কত গল্পের উপাদান আমাদের হাটে-বাজারে, অফিসে, গলিতে ছড়িয়ে থাকে সারাদিন। আর এই উপাদানগুলিই আমাকে ক্রমাগত লিখতে অনুপ্রাণিত করে।'[১] লেখকের এই কথার উপর নির্ভর করে বলা যায় তাঁর 'জংলি বিছে' এবং 'পরমান্ন ও ১১টি গল্প' গল্পসংকলন দুইটি নিখুঁত গল্পরসের ভাণ্ডার। দুটি

গ্রন্থে রয়েছে মোট ২৩টি গল্প। প্রত্যেকটি গল্পের বুনন পরিবেশ-সাপেক্ষে ভিন্ন রকমের। পরিবেশ বলার কারণ হলো, গল্পগুলি পড়ার সময় মনে হয় মানুষের ওপর পরিবেশের যে একচ্ছত্র আধিপত্য সেটা লেখক যেন কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেননি। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে মানুষের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়, সেই দৌড় থেকে কারো নিস্তার নেই। আমাদের প্রত্যেকের মনের ভাবনা ভিন্ন। মানবিকতা কিংবা সহানুভূতি ইত্যাদি শব্দগুলি আজ অনেকটা বেমানান। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা আজ এমন এক অন্ধ বিলাসিতায় জাপটে রয়েছে যে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কিংবা মানুষের প্রতি বিশ্বাস বা ভালোবাসা বজায় রাখা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু মানুষ বাঁচতে চায়। নিজের জন্য বা আপনজনের জন্য তাকে বেঁচে থাকতে হয়। তাই লেখক এই সংকলনের প্রত্যেকটি গল্পে মানুষকে আশার পথ দেখিয়েছেন। আমাদের পরিচিত সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের উত্তরণের পথ তিনি এই গন্থের গল্পগুলিতে অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে উত্তর-পূর্বের অন্যতম ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশের ছবি।

উপন্যাসের মতো ছোটগল্পে মানুষের সম্পূর্ণ জীবনবোধ তুলে ধরা একজন লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও তাঁরা চেষ্টা করেন এবং সেই চেষ্টার মধ্যেই থাকে জীবনবোধের প্রচুর সম্ভাবনা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জীবনধারায় বাংলা ভাষা যেভাবে নানান সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মানুষের এই বিচিত্র সংগ্রামী জীবনে আশার আলোটুকু আজও নিভে যায়নি। এর উদাহরণ এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্য। শ্যামল বৈদ্য, মীনাক্ষী সেন, জয়া গোয়ালা প্রমুখ গল্পকার ত্রিপুরা রাজ্যে বহমান বাস্তব জীবনকে এমন এক ব্যঞ্জনার দ্যোতনায় সামনে নিয়ে এসেছেন যা আমাদের অন্তরকে নানাভাবে নাড়িয়ে দেয়। কাল্পনিক প্রেমের গল্প বা বিলাসিতাকে কেন্দ্র করে গল্প রচনা করার অবকাশ তাঁদের নেই। কারণ এই অঞ্চলে রয়েছে জাতিগত-ভাষাগত বিভিন্ন সংঘাতের ইতিহাস। তাই এই অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা উঠে এসেছে এখানকার সাহিত্যিকদের কলমে। আর হবেই না কেন! আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অবহেলিত, বঞ্চিত। এই অঞ্চলেও যে বাংলা সাহিত্য রচিত হয় তা ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষের কাছে আজও অজানা।

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য জগতে গল্পকার হিসেবে শ্যামল বৈদ্য বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত নাম। তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান নিবন্ধে শ্যামল বৈদ্যের 'জংলি বিছে' এবং 'পরমান্ন ও ১১টি গল্প' গল্পসংকলন দু'টির গল্পগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনার প্রয়াস করা হলো—

ক. মানবিক সত্তার গল্প: শ্যামল বৈদ্যের 'মার্বেল পাথর', 'নেকলেস', 'মাছ,মনিব ও এক চোর', 'অশুভ মিছিল ও আমরা কয়েকজন', 'হারিয়ে যাবার গলিপথ', 'অবিশ্বাসের জমিন' গল্পগুলিতে মানবিক সত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

খ. মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্প: 'ছায়াশ্রিতা', 'এম্বাসাডার', 'অলক ফিরবে না', 'সুতনুকা', 'জংলি বিছে', 'অলীকবাবু', 'জীবন ও ছায়া', 'শব্দের অপেক্ষায় থাকা এক বুড়ো' গল্পগুলি মনোবিশ্লেষণধর্মী।

গ. সামাজিক পরিবেশ পটভূমিকার গল্প: 'ইচাবুড়ি', 'গিরগিট', 'অবেলায়', 'পরমান্ন', 'কালাকাউয়া', 'বর্ণমালা', 'ব্যারিকেড ভাঙ্গার শব্দ' ইত্যাদি গল্পগুলি সামাজিক পরিবেশ পটভূমিকা কেন্দ্রিক।প্রত্যেকটি গল্পের পটভূমি অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের রূপরেখায় রচিত। যেখানে পাওয়া যায় মানব মনের সুষম পরিচয়। গল্পগুলিতে লেখকের কর্তৃত্ব ও পাঠকের বোধশক্তি দুটোই যেন একসঙ্গে চলাচল করে।

প্রত্যেক লেখকের লেখার মধ্যে নির্দিষ্ট উৎস বা বিষয়বস্তু থাকে। শ্যামল বৈদ্যর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারী কেন্দ্রিক বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, একই সঙ্গে রয়েছে মনোবিশ্লেষণের একটি ধারা। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে স্মার্ট বলে প্রতিপন্ন করে চলছে অথচ আজও এই সমাজ তথা মানুষেরা প্রচ্ছন্ন অনেক গোঁড়ামিকে আগলে ধরে রেখেছে। শ্যামল বৈদ্যের 'ছায়াশ্রিতা' গল্পটি তারই উদাহরণ। অরূপ একটি অফিসে কাজ করেন। প্রায় ষোলো-সতেরো বছর আগে মঞ্জুশ্রী নামক এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়। বিপিনের বোন মঞ্জুশ্রী চেন্নাইয়ের ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। বিপিনের মামা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে অরূপের বিয়ের প্রস্তাব করলে অরূপ এই বিয়ে সম্পর্কে মতামত দেওয়ার কোনো অধিকার পায়নি। কারণ তার বাবাই বাড়ির সর্বেসর্বা। তাই মঞ্জুশ্রীর অনুরোধে অরূপ একদিন তার সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা করার কথা ফাইনাল করে। অরূপের বাড়ির মানুষ বিয়ের আগে পাত্রী দেখার বিষয়টি ততটা পছন্দ করেনি যদিও অরূপের ইচ্ছে ছিল একবার নিজের হবু স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মাধ্যমে সম্পর্কটিকে সহজ করে তোলা। কিন্তু এই বাইরে গিয়ে দেখা করাটাই মঞ্জুশ্রীর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের মাঝপথে মঞ্জুশ্রীকে ধর্ষণ করে কারা যেন লেকের পাশে ফেলে রেখে যায়। অপরিচিত মানুষের অমানুষিক ইচ্ছাগুলি বহু মানুষের জীবনকে তছনছ করে দেয়। মঞ্জুশ্রীর দেহ হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরলেও তার মনের মৃত্যু ঘটে সমাজ কর্তৃক নানা কুৎসা এবং নির্মম নিষ্ঠুর কথার দ্বারা। বড় আদরের মেয়ে ছিল মঞ্জুশ্রী। বিয়ের কনে হওয়ার আগে একবার মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখনা ছড়িয়ে আকাশে স্বাধীনভাবে উড়তে চেয়েছিল। কিন্তু সেই পাখনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় তার জীবন

এবং পরিবার। মানুষের নোংরা কথার ফলে তাদের আর এই অঞ্চলে মুখ তুলে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু থাকে না। ঘটনা পরম্পরায় সব দোষ মঞ্জুশ্রীর ঘাড়ে এসে পড়ল। সে একজন নারী তার আবার এত শখ কেন! অরূপের বাবা মঞ্জুশ্রীর ধর্ষণের ঘটনাটি শোনার পর বিয়ের প্রস্তাব ঘুরিয়ে নেন। শুধু তার বাবা নয়, অরূপ নিজেও কথাটি মেনে নিতে পারেনি। মঞ্জুশ্রীকে বিয়ে করলে এই সমাজ আড়ালে-আবডালে নানাভাবে তাকে এবং তার পরিবারকে হেনস্তা করবে। মঞ্জুশ্রী যদিও অপরাধী নয় তবুও এই অপমানের অভিশাপ সে স্ব-ইচ্ছায় মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রিয় বন্ধু বিপিনকে সে জানিয়ে দেয় এই বিয়ে সে করতে পারবে না। এতটা সৎ এবং উদার মন তার নেই। আজ এতটা বছর পর অরূপের সঙ্গে তারই অফিসের একজন কর্মরত নিষ্ঠাবান মহিলার সঙ্গে দেখা হয়। যার নাম সংহিতা। সংহিতাও একজন ধর্ষিতা মেয়ে। যেহেতু সে একজন নষ্ট দেহের নষ্ট মেয়ে তাই তার দেহের প্রতি অফিসের কর্মরত বহু মানুষের লালসা ও কু-নজর রয়েছে। কিন্তু সংহিতার মধ্যে রয়েছে প্রবল নীতিবোধ। তার জীবনে যতই ক্ষতি হোক না কেন অফিসের কাজের প্রতি তার কোনো ধরনের অবহেলা নেই। তার এই সৎ চরিত্রটিকে এই অফিসের মানুষেরা ব্যঙ্গ করে। সংহিতার মতো মেয়েরা সমাজের কোনো সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত হতে পারে না। তাই গল্পটিতে আমরা দেখি গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংহিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সেই অভিযোগের ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায় এই অফিসেরই কয়েকজন ক্লার্ক মহিলা। অরূপের কাছে সংহিতার এই অভিযোগ এসে পৌঁছালে অরূপের মনে পড়ে যায় মঞ্জুশ্রীর সেই অসহায় জীবনটিকে। সেই সময় অরূপ যদি সাহস করে মঞ্জুশ্রীকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দিতো তবে হয়তো মঞ্জুশ্রী বেঁচে থাকার একটি সম্বল খুঁজে পেতো। এইসব কথা মনে করেই অরূপ সংহিতাকে মানবিকতার খাতিরে জীবনে হেরে না যাওয়ার নানান উপদেশ দেয়। একজন ধর্ষিতা মেয়ের সামাজিক মর্যাদা সে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তবে এই সম্মানের মধ্যেও রয়েছে অরূপের মনে সন্দেহপূর্ণ নানা প্রশ্ন। সত্যিই কি সংহিতা খারাপ মেয়ে? তাই তাকে কেউ পছন্দ করে না? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল সংহিতা নন্দী। সমাজ সর্বদাই মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। বিশেষ করে মেয়েদের ওপর যখন ধর্ষণের মতো জঘন্য বিষয়ের টেগ লেগে যায়। সমাজের মানুষ যেন সার্বজনীন অধিকার পেয়ে যায় সেসমস্ত নারীকে নানা কুপ্রস্তাব দিতে, টিটকিরি ও ব্ল্যাকমেল করতে। সতেরো বছর আগে মঞ্জুশ্রীকে এমনভাবেই হেয় করা হয়েছে আজ এত বছর পর সংহিতা নন্দীকেও একইভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। যুগের পরিবর্তন হয়েছে। চিঠির পরিবর্তে আজ মানুষের হাতে-হাতে রয়েছে স্মার্টফোন। কিন্তু মানুষের মন-বিবেক-বিবেচনা সেই আলো-আঁধারি

আদিম যুগেই নির্বাসিত। বিশ্বায়নের যুগে আজও নারীর প্রতি সমাজ বিবেকহীন। সমাজের প্রত্যেক মানুষ যদিও খারাপ নয় কিন্তু সেই সৎ সাহস কয়জনের রয়েছে? এই প্রশ্নটাই গল্পকার শ্যামল বৈদ্য তাঁর এই গল্পের মাধ্যমে শৈল্পিকভাবে ছুঁড়ে দিয়েছেন। অরূপ আমাদের মতোই তেমন একজন সমাজের মানুষ। জীবনের সব সুখ, আনন্দ, আশাকে কেড়ে নিয়ে ধর্ষকরা আপন গর্বে বেঁচে থাকে অথচ ধর্ষিতারা বেঁচে থাকে অপরাধী হয়ে। এই ভাবনার কোনো অন্ত নেই, কোনো শাসন নেই। এমন করেই সমাজ আরও উন্নত হবে আরও সমৃদ্ধ হবে কিন্তু মন পড়ে থাকবে সেই গোড়ামিকে আঁকড়ে ধরে। যুগ যুগ ধরে সীতাকেই নির্বাসন দেওয়া হয়েছে রাম রয়েছেন সমাজের একজন কৃতি ও আদর্শ শাসক রূপে। এই যে প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা সমাজের নারীর প্রতি এক বিকৃত মনোভাবনা তা গল্পটিতে সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তাছাড়া, ভাব-ভাষা-বর্ণনায় কোথাও লেখকের বিক্ষিপ্ততার অবকাশ নেই। জীবনের সূক্ষ্মতম বিন্দুকে উন্মোচন করেছেন একটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ করে। তাছাড়া, তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলি আত্মকেন্দ্রিক নয়, তারা আত্মসচেতন এবং আধুনিক মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ।

'সুতনুকা' গল্পে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের অসাড় প্রেমহীন মনটিকে। মলিকে একটি অপরিচিত নামহীন ছেলে প্রতিদিন রাস্তায় অনসুরণ করে। সে মুখে কিছু বলে না শুধু একনিমিষে চেয়ে থাকে মলির প্রতি। এই চেয়ে থাকার মধ্যেই যেন রয়েছে তার অসীম আনন্দ। মলি বঝুতে পারে না কী চায় সেই ছেলেটি। সেই বিষয়টি জানার আগ্রহে সে একদিন ভরা বাজারে ছেলেটিকে হাতে-নাতে ধরে। আশ্চর্যভাবে ছেলেটি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সেই থেকে শুরু হয় মলির নানা ধরনের ভাবনাচিন্তা। প্রেম-প্রীতির প্রতি তার কখনোই কোনো ধরনের ইচ্ছা ছিল না। পুরুষের স্বভাব সম্পর্কে তার নিজস্ব কিছু মতামত ছিল। আসলে শ্যামল বৈদ্যের লেখার মধ্যে পরিবেশ কেন্দ্রিক নারী ভাবনার বিভিন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে নারীবাদের দোহাই দিয়ে নানা ধরনের মন্তব্যকে লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শ্যামল বৈদ্য একজন নারীর প্রচ্ছন্ন স্বভাবকে তুলে ধরার সাহস করেছেন। মলির মতো অনেক মেয়েরাই চায় আমোদে-সৌন্দর্যে পুরুষের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এই বাস্তব মনোভাব বহুলাংশে স্বীকৃত নয় যদিও এই চরম সত্যটিকে অস্বীকারও করা যায় না। গল্পের শেষে আমরা দেখি সেই ছেলেটি মলিকে আর দেখতে আসে না। যে অহংকারে এতদিন মলির হৃদয় মত্ত ছিল সেই অহংকারকে কাঙাল করে দিয়ে চলে গেল সেই অজানা নামহীন ছেলেটি। বোধকরি এমনতর গল্পগুলি আমাদের অন্তর্মনের ভাবনা-বিশ্বকে চিনিয়ে দেয়।

মনের সুপ্ত ভাবনায় নানা ধরনের প্রশ্নকে জাগিয়ে তুলে। এখানেই একজন লেখকের সার্থকতা প্রকাশ পায়।

'জংলি বিছে' গল্পে হরিশ এবং মালিজুকের প্রেম-ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। মালিজুক পাহাড়ি মেয়ে। পড়াশোনার জন্য তাকে ত্রিপুরা ছেড়ে অন্য রাজ্যে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে মালিজুক হরিশ নামক একজন ভিন্ন রাজ্যের যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। মালিজুকের পাহাড়ি বন্ধু তাহির এই সম্পর্কটিকে মেনে নিতে পারেনি। তাহির মালিজুককে ভালোবাসে। তাই অভিমান ও ক্ষোভে সে মালিজুক এবং হরিশকে খুন করতে যায়। অবশেষে অনেক বিবেক দংশনে দগ্ধ হয়ে তাহির মালিজুকের প্রতি হরিশের নিঃস্বার্থ প্রেমের স্বরূপ অনুভব করে। তাদের সম্পর্ককে তাহির জীবনের একটি সামান্যতম বিষয় হিসেবে মেনে নেয়। সামাজিক অস্থিরতার পরিবর্তে স্থিতিশীল এই মনোভাবটিকে নিঃসন্দেহে গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু বলা যায়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বহিরাগত মানুষের এই মেলবন্ধনই সামাজিক শান্তির রূপ। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্রই তো ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য। শ্যামল বৈদ্য তাঁর এই গল্পটির মধ্যে সেই একতার সুরটিকেই আন্দোলিত করে তুলেছেন। বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মানুষের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এমনতর আন্ত:রাজ্য বিবাহ বা প্রেম মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বহুবছর ধরে প্রভাব ফেলে আসছে। আর ভবিষ্যতেও এর প্রভাব থাকবে বলে আশা করা যায়।

'অ্যাম্বাসাডর' গল্পটিতে আমরা দেখি তড়িৎবাবু বুড়ো হয়েছেন। তার অত্যন্ত শখের একটি অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ছিল। একদিন সেই গাড়িটি তার ছেলে বিক্রি করে দেয়। তখন থেকে বুড়ো তড়িৎবাবু জীবন-সম্পর্কে ভীষণভাবে নিঃস্পৃহ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন যৌবন এবং বার্ধ্যক্যের প্রতিযোগিতায় যুব সমাজই জয়ী হয়। তাই তড়িৎবাবু মৃত্যুর মতো চরম সত্যটিকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রতিদিন শ্মশানে যাতায়াত শুরু করেন। মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনের এই চরম সত্যের সম্মুখীন হয়। শ্যামল বৈদ্য জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতাকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনের চরম সত্য হচ্ছে মৃত্যু— একথাটি বলতে ভুলে যাননি লেখক। বিশ্বাসের জগৎ থেকে সম্প্রসারিত এই আখ্যান মানব জীবনের দলিল। আজকের আধুনিক যুগে বুড়োরা হচ্ছেন পরিবারের বোঝা এবং এই সমস্যার উপায় হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। বৃদ্ধাশ্রম থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য তড়িৎবাবু প্রতিদিন মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর একদণ্ড শান্তি নেই। গল্পটির মধ্যে লেখক বলতে চেয়েছেন, চেতনাই যেন মানুষের যাপনকথার পাথেয় হয়। সংস্কৃতি বহুধা রচিত। একসময় যৌথ পরিবারে বৃদ্ধরাই ছিলেন অহংকার। সেই বহুধা-সমৃদ্ধ সংস্কৃতি যেন লুপ্ত

না হয়। বাঙালির চিরন্তন শুদ্ধ জীবনে যাপনে এধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক আজীবন বহাল থাকুক এটাই গল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

শ্যামল বৈদ্যের গল্পে দেখা যায় জীবনবোধ এবং মানুষের আত্মিক সম্পর্কের গভীর ছোঁয়া। নিছক গল্প লেখা কেবল তাঁর উদ্দেশ্য নয়। গল্পের মাধ্যমে যেন মানবিক সুরটি পাঠকের মনের অন্তরে পৌঁছায় তার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন তিনি। কীভাবে মানুষ তার পরিচয় হারাচ্ছে সেই বাস্তব অনুভূতি তাঁর গল্পের মধ্যে প্রকাশ পায়। 'মার্বেল পাথর' গল্পটিতে আমরা দেখি সুমিত একদল জঙ্গি কর্তৃক আহত হয়ে আদিবাসী দম্পতি বাছই (বউদি) এবং দেবেন্দ্রের নিঃস্বার্থ সেবা-যত্নে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। সেই বাছই জরায়ুতে টিউমার আক্রান্ত হয়ে সুমিতের কাছে সাহায্যের আশায় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সুমিতের স্ত্রীর নানান কটাক্ষবিদ্ধ কথা বাছই এবং দেবেন্দ্রের মনকে আহত করে। সুমিত প্রাণপনে চেষ্টা করে বাছইকে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু তার স্ত্রীর এমন স্বার্থপর ব্যবহারে বাছই নিজের আত্মসম্মানকে কোনোভাবেই আহত হতে দেয়নি। পাহাড়ি, নিঃস্বার্থ আপনভোলা আদিবাসী দম্পতি সুমিতকে না জানিয়ে রাতারাতি তার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বাছইয়ের নরম মন এবং সুমিতের স্ত্রী সুজাতার যান্ত্রিক মন আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতা সমৃদ্ধ মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করে। পাহাড়ি মনের অন্তর ছোঁয়া হৃদয় নগরজীবনের সভ্যতাকে মানবিকতা শেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। নিঃস্বার্থ মনে মানুষের সাহায্য করতে ব্যর্থ এই শহরকেন্দ্রিক মানুষগুলি। তারা আপন আভিজাত্যে ব্যস্ত। তাদের মনের কাছে নেই কোনো সুহৃদের পরিচয়। এই গল্পে সুজাতা তেমনি এক নির্দয় আভিজাত্য-বিলাসিতায় মত্ত সামাজিক মানুষ। ভালো এবং মন্দ এই দুইয়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত। সময় সাপেক্ষে যার মনের আসল অভিপ্রায় প্রকটিত হয়ে ওঠে।

শ্যামল বৈদ্যর গল্পের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যৌবনের অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি। 'নেকলেস' গল্পটি দিয়ে এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অত্যাধুনিক জীবনের একটি নতুন সংকট হচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। সংসার জীবনে স্বামী কিংবা স্ত্রীকে ঠকিয়ে নতুন পরিবেশে নিজেকে তৈরি করার মানসিকতা আজ সমাজে ভীষণভাবে দেখা যাচ্ছে। সোমা এবং প্রবালের জীবনেও সেই একইরকম ছবি পরিস্ফুট। প্রবাল এবং তার স্ত্রী মালবিকার কুড়ি বছরের দাম্পত্য জীবনে রয়েছে একটি ছেলে। তবে মালবিকার ইউটেরাস রিমোভ করার পর থেকে তার একঘেয়েমি অসুস্থতায় প্রবাল অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। দাম্পত্য কলহ, অভাব-অভিযোগের ও মানসিক টানাপড়েনের ফলে তাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ফলস্বরূপ প্রবাল সোমার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক জড়িয়ে পড়ে। তবে সম্পর্কটা ছিল শারীরিক, মোটেই প্রেম নয়। প্রবালের মতো

মানুষদের জীবনে 'মাঝে মাঝে এই সোমা, নিশা-রা কিছুটা রিলিফ নিয়ে আসে...'।[২] আত্মমুক্তির উপায় সন্ধানে মানুষের চিরন্তন আত্মজিঘাংসা অনেকাংশে বড় হয়ে ওঠে। সময়ের এই বিশেষ প্রবণতা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবনকেও বাদ দেয়নি। নগরের সভ্যতাগর্বী মানুষেরা ভুলে যায় লোকসমাজের নিয়ম। বৈবাহিক নীতি-নিয়ম তথা দায়িত্ব একপ্রকার ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষের আনন্দ বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে এবং নারীর আনন্দ কুড়িয়ে নেওয়ার মধ্যে সমাজের রঙখেলা শুরু হয়। এই ধারায় শুরু হয় প্রবাল এবং সীমার পরকীয়া কাহিনি। তবে প্রবালের মনে সোমার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। সোমার মতো মেয়েরা সত্যি প্রেমের অর্থ বোঝে কিনা! অথচ সেই প্রবাল তার স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে সোমাকে তার নিজের দিদির বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে প্রবালের দিদির মতো মানুষের আত্মিক-সম্বন্ধ সোমার আত্মচিন্তাকে নাড়িয়ে তুলে। সোমা বুঝতে পারে পরকীয়া সম্পর্কে মত্ত হয়ে সে আজ এমন একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে তাদের সম্পর্কের সামাজিক কোনো স্বীকৃতি নেই। "নষ্টামি হল পুরুষের অলংকার আর মেয়েদের কলঙ্ক।"[৩] পুরুষেরা যদি পরকীয়া সম্পর্কে না জড়ায় তবে তারা আনস্মার্ট এবং মেয়েরা পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে তুললে বাজারে তাদের দর ঠিক মাকাল ফলের মতো। যা দেখতে সুন্দর কিন্তু বেমানান। 'নেকলেস' গল্পটিতে লেখক নর-নারীর এই ভিন্ন জীবন দর্শনকে ঠিক এমনভাবেই তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি সামাজিক মর্যাদার সীমারেখা রয়েছে। তাকে ডিঙিয়ে সমাজ বিরোধী কাজের সঙ্গে লিপ্ত হওয়া একেবারেই যুক্তিসংগত নয়।

শ্যামল বৈদ্য শ্রমজীবী মানুষদের জীবন নিয়েও গল্প লিখেছেন। 'অবেলায়' গল্পটি তারই উদাহরণ। মনোময় চক্রবর্তী একজন ব্রাহ্মণ। সে দিনমজুর। সরকার থেকে রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল একমাস ধরে। হঠাৎ করে সেই নির্মাণ কাজের স্থলে একটি দুর্ঘটনায় মনোময় তার পায়ে ভীষণভাবে আঘাত পায়। মনোময়ের এই দুর্দিনের সঙ্গী ছিল পুটি। জাতিতে সে নমঃশূদ্র। এই নম:শূদ্র মেয়ের সেবা-যত্নে মনোময় আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। পুটির প্রতি মনোময়ের মনে প্রেমের অনুভূতি জাগে। সে পুটিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ছোটজাত ও বড়জাতের তফাৎ পুটি এবং মনোময়ের প্রেমের সম্পর্কটিকে তছনছ করে দেয়। অসুস্থ মনোময়কে সুস্থ করার সময় সমাজের কোনো ব্যক্তি এগিয়ে আসেনি। এসেছিল পুটি তার সমস্ত কিছু বিলিয়ে। পর পুরুষের সঙ্গে একলা ঘরে থাকা বিষয়টি আজও আমাদের সমাজ স্বীকৃতি দেয়নি। এই সমস্ত গম্ভীর বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে পুটি তার আন্তরিকতা নিয়ে মনোময়ের সেবা-যত্ন করেছে। অথচ মনোময় যখন পুটিকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত হয় তখন সে বিষ্ণুপূজার মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণ করে ছোটজাতকে বিয়ে করার পাপ থেকে মুক্ত

হতে চেয়েছে। মনোময়ের এই স্বভাবটি পুটির পছন্দ হয়নি। হতে পারে সে গরীব ঘরের মেয়ে এবং ছোটজাত কিন্তু আত্মসম্মানবোধ তার প্রবল। পুটি যে কয়টা কাপড়-চোপড় নিয়ে মনোময়ের বাড়িতে এসেছিল সেগুলি নিয়ে নীরবে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না। মনোময় পুটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু সে অপেক্ষার অবসান হয় না। মনোময় এবং পুটি দুইজনই শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যেও রয়েছে জাত-পাতের জটিল সমস্যা। লেখক তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়েছেন। তাদের জীবনকথায়ও ইচ্ছাপূরণের আয়োজন কম নয়। উপার্জনের অনিশ্চয়তা তাদের জীবনের চরম সত্য। অথচ এই অনিশ্চয়তার জীবনেও রয়েছে জীবনের অসম্ভব চাহিদা। শ্যামল বৈদ্যর এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাঁর নিখুঁত গল্প রচনার সম্বল। প্রাতিষ্ঠানিক সভ্যতা এবং আদর্শকে ডিঙিয়ে সমাজে মানুষের মানবিক অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। 'আরে বামুন অইয়া নম:শূদ্র বিয়া করুম ঠাকুরের কাছে মাপ চাইতে অইব না।'[৪] মনোময়ের এই উক্তিই 'অবেলায়' গল্পটির সারসংক্ষেপ।

বাস্তব জীবনের আলেখ্য শ্যামল বৈদ্যের গল্পে উপস্থিত। 'গিরগিট' গল্পটি এর উদাহরণ। এই গল্পের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে মানুষের জড়জীবনের চেতনাহীন অনুভূতি। 'গিরগিট' গল্পে বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে সংবাদ মাধ্যমের অসীম প্রভাবের দিকটিকে দেখানো হয়েছে। অর্থলিপ্সু মানুষের অসীম চাহিদা অজয়ের নিরপরাধ কর্ম জীবনের প্রতি প্রশ্ন তুলে দেয়। ভুল সাংবাদিকতার স্ক্যাণ্ডেলে অজয়ের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মানে এই নয় সমস্ত কিছুর সঙ্গে আপোশ করে চলা। অজয় তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে ঠিক এই কাজই যেন করতে পারে না। সততা, মূল্যবোধ, মানবিকতার অর্থ সে যেন নতুন করে শিখলো। সমাজে 'নির্মল' শব্দটি বেমানান। কথাটি অজয় খুব ভালো করে বুঝতে পারে। যতদিন সময় যাচ্ছে সমাজের গিরগিট রূপ তার কাছে প্রত্যক্ষভাবে এসে ধরা দিচ্ছে।

এবার আসছি শ্যামল বৈদ্যের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'পরমান্ন এবং ১১টি গল্প'-এর আলোচনায়। এই গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "ভেসে থাকার চেয়ে ডুবে থাকাতেই তৃপ্তি আসে বেশি। আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি এই কথা। ডুব দিতে গিয়ে ভেসে যাচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের লেখালেখি। সে কারণেই ছোটগল্প আর লেখা হয়ে উঠছে না"[৫] এমন সৎ স্বীকারোক্তি খুব কম লেখকের মধ্যে দেখা যায়। জীবন মানে নতুনত্বের স্রোত। স্বাভাবিকভাবে এই জীবন পরিধি সীমিত। নানান বৈচিত্র্যে পরিস্ফুট। এই বৈচিত্র্যের রস শ্যামল বৈদ্যের গল্পে দেখা যায়। এই গ্রন্থের গল্পগুলির কাহিনি-ঘটনা সহজ জীবনের গতিতে এগিয়ে গেছে। গল্পগুলি যে তাঁর নিজস্ব জীবনের সুক্ষ্ম ঘটনার পর্যবেক্ষণে গড়ে

উঠেছে তা আমরা লেখকের সঙ্গে কথাবার্তার সূত্রে জানতে পেরেছি। 'অবিশ্বাসের জমিন', 'ইচা-বুড়ির কথা' গল্পগুলি তার উদাহরণ। কেবল কাহিনি নয় তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চরিত্রগুলি কাহিনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাস্তব-জীবনের রক্ত-মাংসে গড়া।

'পরমান্ন' গল্পটিতে নারায়ণ দাস একজন গুণিনের ছেলে। একপ্রকার অন্ধবিশ্বাসকে হাতিয়ার করে সে মানুষকে ঠকিয়ে কখনো ভালো ভালো খাবার আবার কখনো বড়মাপের টাকা-পয়সা রোজগার করে থাকে।

সম্ভাবনাময় চিন্তায় শিল্পীর নতুন চেতনার উদ্ভব হয়। বর্গ থেকে ব্যক্তির সমূহ চিন্তাধারায় সমাজ বিরুদ্ধ অভিমান 'মাছ, মনিব ও এক চোর' গল্পে দেখা যায়। ভম্বল দাস একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি। মাছধরা এবং বিক্রি করা তার পেশা। এই পেশায় যুক্ত হয়ে তিনি আর্থিক প্রতিপত্তির দৌলতে গ্রামে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। এই শক্তির প্রকাশে তাঁর হারিয়ে যাওয়া একুশ কেজির বিশাল মাছটির চুরির দায় গিয়ে পড়ে গ্রামেরই হতদরিদ্র কাঙাল নমঃদাস সাধনের উপর। কিন্তু শেষে জানা যায়, সাধন সে মাছ চুরি করেনি। চুরি করা যদিও তার পেশা কিন্তু সকলের সামনে সত্য কথা স্বীকার করারও সাহস সে রাখে। তার দাপটভরা স্বীকারোক্তি ভম্বল দাসের মতো মানুষের ভিতরটিকে নাড়িয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে, সাধন সেই মাছ চুরি করেনি এবং সেই থেকে সাধন গ্রামের বাইরের জঙ্গলে সদর্পে বসবাস শুরু করে। গল্পটিতে দুজন ব্যক্তিই নিম্নবর্গের অন্তর্গত। তফাতটা শুধু বিত্তের কম-বেশি পরিমানের। বর্গ চেতনার সংগ্রামশীল জীবন গল্পটির উপজীব্য বিষয়বস্তু।

বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দোলনে পাহাড়ি পানোজয় এবং বাঙালি সুখেনের বন্ধুত্বের গভীরতা 'অশুভ মিছিল ও আমরা কয়েকজন' গল্পে দেখা যায়। পাহাড়ি এবং বাঙালির দাঙ্গায় মানুষের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা থেকে মুক্ত হতে দেখা যায় পানোজয় এবং সুখেনকে। তারা একে অপরকে বিশ্বাস করে। আশ্বাস রাখে একতার— 'অশুভ মিছিল ও আমরা কয়েকজন' গল্পটি এই আদর্শে রচিত।

বিদেশি ভুবনের জীবনকে নিয়ে 'কালা কাউয়া' গল্পটি রচিত। ভুবন বংশানুক্রমিক জমি-মাটি ছেড়ে এদেশে এসেছে। তোতা পাখিকে সঙ্গী করে সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ তার জানা নেই। ভুবনের বাবাও এই বিদ্যা জানতেন। তবে এই বিদ্যার প্রয়োগ তার নিজের জীবনে ঘটেনি। তাছাড়া রাজনৈতিক নানা চক্রান্ত, এনআরসির মতো বিশাল প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তাহীন জীবন সংকট ভুবনের মতো মানুষদের বেঁচে থাকার সম্বলটুকু কেড়ে নেয়। কারণ যাদের নিজেদের জমি এদেশে নেই তাদের নিজস্ব নথির অভাব অমূলক নয়। এ সমস্ত চিন্তায় ভুবনের জীবনে যে 'কালা কাউয়া'র ছাপ

পড়েছে তা ভুবনের বুঝতে বাকি নেই। ভুবন দেশ খোঁজে কিন্তু দেশ আর খুঁজে পায় না।

পরিবেশ তথা রাজনীতির পরিমণ্ডলে রচিত এমনই আরেকটি গল্প হলো 'ব্যারিকেড ভাঙার শব্দ'। ভোটের সময় রাজনৈতিক দলাদলিতে সমাজে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় তা এই গল্পের চরিত্র অরুণাংশের মধ্যে ফুটে ওঠে। আবার এমন পরিবেশেও যারা প্রচুর সাহসে ও দৃপ্তকণ্ঠে এগিয়ে যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় অরুণাংশের মেয়ে ঋতজার মধ্যে। বিরোধী বাড়িতে ঢিল ছোঁড়া, আতঙ্কের আমদানি করা, গুণ্ডামি ইত্যাদি বিষয়গুলি এই গল্পে দেখা যায়। এই সমস্তকে উপেক্ষা করে উজ্জীবিত স্বরে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে জীবনকে জয় করা, ভয়কে প্রশ্রয় না দেওয়া। অরুণাংশের মনে এই উদ্দীপ্ত জয়ের প্রকাশ ঘটে।

ব্যক্তি এবং জাতিসত্তার সংঘর্ষে বাঙালি আজ দ্বিধাগ্রস্ত। তার উপর ভেসে আসছে আধুনিকতার অন্ধ-উৎস। বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব আজ প্রশ্নের মুখে। এইরূপ পটভূমিতে 'জংলি বিছে' ও 'পরমান্ন ও ১১ টি গল্প' গল্পসংকলন দু'টি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সাহিত্যিক দলিল। শ্যামল বৈদ্য যিনি মানুষের আচরণের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন গল্পের উৎস। তাঁর লেখার প্রেরণা হচ্ছে পৃথিবীর মানুষের বিশাল এবং ব্যাপক সম্পর্ক ও জীবন পটভূমি। লেখকের এই নবীনতর চেতনাবোধ ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্ভাসিত রূপরেখায় উজ্জীবিত হয়ে থাকুক।

তথ্যসূত্র :

১) বৈদ্য শ্যামল, জংলি বিছে, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রকাশ কাল ২০১৫, পৃ: ৫
২) তদেব, পৃ: ৭১
৩) তদেব, পৃ: ৭৪
৪) তদেব, পৃ: ১১
৫) বৈদ্য শ্যামল, পরমান্ন ও ১১টি গল্প, পূর্বমেঘ পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, ভূমিকাংশ

শ্যামল ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের আন্তঃসম্পর্ক : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

রেশ্মী বীর

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সমকালীন সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার বহুমাত্রিক প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিশ্বায়ন, নগরায়ণ, প্রযুক্তিনির্ভর জীবন, পরিবর্তিত পারিবারিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সন্ত্রাস, পরিবেশগত বিপর্যয়, প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা এবং মূল্যবোধের ক্রমাবক্ষয় এই সমস্ত উপাদান বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনবোধ ও মানসিক জগৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সমকালীন ছোটগল্পকাররা বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহের বিবরণে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের অন্তর্জগৎ, মানসিক দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বসংকট এবং মানবিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপোড়েনকে শিল্পসম্মতভাবে রূপ দিয়েছেন। ফলে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্ব পরস্পরের পরিপূরক রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

এই ধারার অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্পকার শ্যামল ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৬৪)। তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন জীবনের বহুবিধ সংকট যেমন বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি মানুষের মনোজগতের জটিল স্তরগুলিও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর গল্পে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, বিশ্বায়নের অভিঘাতে পরিবর্তিত জীবনধারা, শিশুমনের উপর অতিরিক্ত প্রত্যাশার চাপ, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মানসিক অভিঘাত, পারিবারিক মূল্যবোধের পরিবর্তন, নিঃসঙ্গতা, স্মৃতি, ট্রমা এবং মানবিকতার সংকট এক আন্তঃসম্পর্কিত বাস্তবতার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। গল্পকার বাহ্যিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরিত্র নির্মাণ করলেও প্রকৃত গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঘটনাগুলির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ায়। ফলে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি কেবল সমাজের প্রতিনিধি নয়, তারা সময়ের মানসিক ইতিহাসেরও বাহক।

এই প্রবন্ধে শ্যামল ভট্টাচার্যের নির্বাচিত ছোটগল্পসমূহের আলোকে বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গল্পগুলিতে প্রতিফলিত সমকালীন সমাজবাস্তবতা, ব্যক্তি-মানসের রূপান্তর, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, যুদ্ধ ও বিপর্যয়ের মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত, শিশুমনের সংকট এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নকে। এর মাধ্যমে শ্যামল ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের

পারস্পরিক নির্ভরতা এবং তাঁর শিল্পভাবনার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

২

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে শ্যামল ভট্টাচার্য একজন বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সাহিত্যস্রষ্টা। কথাসাহিত্য রচনার পাশাপাশি অনুবাদচর্চা এবং ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যিক, অনুবাদক ও ভাষাবিদ এই তিনটি পরিচয়ের সম্মিলনে তাঁর সৃজনজগৎ এক বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরার আগরতলায় তাঁর জন্ম। বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় সেই অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

কর্মজীবনের সূচনায় ১৯৮১ সালে তিনি ভারতীয় বায়ুসেনায় এয়ারক্রাফ্ট কন্ট্রোলার হিসেবে যোগদান করেন। প্রায় দুই দশক ধরে এই দায়িত্ব পালন করে ২০০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরতা দিয়েছে। বিমান পরিচালনা-সংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশ, সামরিক অনুশাসন, যুদ্ধকালীন বাস্তবতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তাঁর গল্পে প্রত্যক্ষ কিংবা প্রতীকী রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা ও শিল্পসত্তার একটি সার্থক সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

শ্যামল ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্মে বিশ্বায়নের প্রভাব, বহুসাংস্কৃতিক সহাবস্থান, মানবিক মূল্যবোধের সংকট এবং সমকালীন সমাজবাস্তবতার নানা দিক সংবেদনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিশীলতা পাঠককে কেবল গল্পের জগতে সীমাবদ্ধ রাখে না, তা সমাজ, সময় এবং মানুষের অস্তিত্বসংক্রান্ত নানা প্রশ্নকে নতুনভাবে অনুধাবনের সুযোগ করে দেয়। এই সাহিত্যভাবনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'জামিছলঙ' এবং 'ভারোং পাখির নাচ' গল্পসংকলনের একাধিক গল্পে। যেখানে সমকালীন জীবন, প্রান্তিক সমাজ, মানবিক সম্পর্ক এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতার নানা দিক শিল্পিত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণার আলোকে বিচার করলে, 'জামিছলঙ' এবং 'ভারোং পাখির নাচ' সংকলনদ্বয় বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতির এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

৩

শ্যামল ভট্টাচার্যের 'জামিছলঙ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'চক্রবর্তী বক্রবান' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে গল্পটি একজন ফাইটার পাইলটের উড্ডয়ন-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং মানুষের মনোজগতের অনিশ্চয়তা, ভয়, সংকট, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক দৃঢ়তার এক গভীর শিল্পিত উপস্থাপনায় পরিণত হয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রঞ্জনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষের সংকট মুহূর্তে মানসিক প্রতিক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো দিগ্‌ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা। আকাশে উড্ডয়নের সময় রঞ্জন যখন চারপাশের দিকনির্দেশ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে না, তখন তার মধ্যে তীব্র মানসিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এই দিগ্‌ভ্রান্তি কেবল শারীরিক নয়, এটি মানুষের অভ্যন্তরীণ মানসিক বিভ্রান্তিরও প্রতীক। জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ যেমন কখনো সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনি রঞ্জনের অভিজ্ঞতাও সেই মানসিক অবস্থারই প্রতিফলন। সংকটের মুহূর্তে মানুষের মধ্যে ভয় একটি স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া। গল্পে রঞ্জনের মধ্যেও সেই ভয় কাজ করে। কিন্তু সে ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে প্রশিক্ষণ, যুক্তিবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে। ফলে গল্পটি দেখায় যে ভয় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলেও মানসিক স্থিতিশীলতা ও আত্মসংযমের মাধ্যমে তাকে অতিক্রম করা সম্ভব। এই দিকটি চরিত্রটির মানসিক পরিপক্কতার পরিচায়ক।

গল্পে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। রঞ্জন যখন সমস্ত মনোযোগ আর্টিফিশিয়াল হরাইজনের ওপর কেন্দ্রীভূত করে নিজের অবস্থান পুনর্নির্ধারণের চেষ্টা করে, তখন তা কেবল একজন দক্ষ পাইলটের পেশাগত আচরণ নয়, সেই সঙ্গে তা সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের মানসিক সংযম ও আত্মবিশ্বাসেরও প্রকাশ। বাহ্যিক পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, মানসিক স্থিরতা মানুষকে বিপদ থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে গল্পে এই উপলব্ধি গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পারিবারিক প্রসঙ্গগুলিও চরিত্রের মানসিক জগতকে নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অসুস্থ পিতা, সংসারের আর্থিক চাপ এবং পারিবারিক দায়িত্ব রঞ্জনের মানসিক অবস্থার ওপর এক ধরনের নীরব চাপ সৃষ্টি করে। যদিও সে পেশাগত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে, তবু পারিবারিক বাস্তবতা তার অন্তর্জগতে উদ্বেগ ও দায়বোধের জন্ম দেয়। অর্থাৎ ব্যক্তি-মানস গঠনে পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক বাস্তবতার প্রভাবও গল্পে স্পষ্টভাবে উপস্থিত।

গল্পের প্রতীকগুলিও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ বহন করে। আকাশ, উড্ডয়ন, দিগ্‌ভ্রান্তি এবং আর্টিফিশিয়াল হরাইজনের মতো উপাদানগুলি মানুষের মনের অনিশ্চয়তা, লক্ষ্যচ্যুতি এবং পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। বিশেষত আর্টিফিশিয়াল হরাইজন কেবল একটি যান্ত্রিক নির্দেশক নয়, এটিকে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যুক্তিবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক স্থিরতার প্রতীক হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'চক্রবর্তী বক্রবান' গল্পটি মানুষের ভয়, উদ্বেগ, দিগ্‌ভ্রান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সংকট-উত্তরণের মানসিক প্রক্রিয়াকে শিল্পিতভাবে রূপায়িত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি পাঠ করলে বোঝা যায় শ্যামল ভট্টাচার্য একটি সামরিক অভিজ্ঞতার বর্ণনার পাশাপাশি মানুষের অন্তর্জগতের জটিলতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাসের এক মানবিক আখ্যান নির্মাণ করেছেন।

'পুতলি' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি মূলত একটি শিশুমনের বিকাশ, পরিচয়-সংকট, মানসিক চাপ এবং পিতামাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিত্বের বিকৃতির কাহিনি হিসেবে প্রতিভাত হয়। শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশকে উপেক্ষা করে যখন তাকে কেবল সাফল্য অর্জনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটলেও আবেগ, অনুভূতি এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ব্যাহত হয়। এই দিক থেকে 'পুতলি' শিশুমনের ওপর আরোপিত মানসিক চাপের এক গভীর শিল্পিত দলিল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পুতলি শৈশব থেকেই বাবা-মায়ের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাহক। নিজের ইচ্ছা বা স্বাভাবিক শৈশবের পরিবর্তে তাকে নিরন্তর তথ্য মুখস্থ করা, অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন এবং অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। ফলে তার ব্যক্তিসত্তা ধীরে ধীরে দমিত হতে থাকে। মনোবিজ্ঞানের আলোকে বলা যায়, পুতলির নিজস্ব পরিচয় গড়ে ওঠার সুযোগ সংকুচিত হয়। সে নিজের পরিবর্তে অন্যের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে। তার সাফল্য তাই ব্যক্তিগত অর্জন না হয়ে তা অভিভাবকের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে মাত্র।

এই গল্পে পুতলির মানসিক বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। অসংখ্য তথ্য ও সূত্র মুখস্থ করার ক্ষমতা তাকে বাহ্যিকভাবে অসাধারণ করে তুললেও বাস্তব জীবনের মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয়। বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে না পারা, তাদের আচরণ বুঝতে অসুবিধা এবং শিক্ষকদের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনে অক্ষমতা তার সামাজিক ও আবেগগত বিকাশের সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। এর ফলে

তার মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা, গুটিয়ে থাকা এবং মানসিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। পুতলির চরিত্রে আবেগগত অবদমনের বিষয়টিও লক্ষণীয়। শৈশবের স্বাভাবিক আনন্দ, খেলাধুলা, বন্ধুত্ব বা স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তার অনুভূতির স্বাভাবিক প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। সে ধীরে ধীরে এমন এক যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যেখানে চিন্তা ও অনুভূতির পরিবর্তে মুখস্থবিদ্যা এবং নির্ধারিত লক্ষই প্রধান হয়ে ওঠে। ফলে তার ব্যক্তিত্বে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার পরিবর্তে কৃত্রিমতা প্রাধান্য লাভ করে। এই গল্পে ব্যবহৃত প্রতীকগুলিও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। লেখকের উক্তি— "এই মহাকাশে এরকম অসংখ্য প্রাণহীন উপগ্রহ ঘুরছে সুতো বাঁধা পুতুলের মতন। পুতুলেরা ঘুরছে অপত্য স্নেহের মহাকর্ষে।"[১] এখানে 'উপগ্রহ' ও 'পুতুল' কেবল রূপক নয়, এগুলি শিশুর মানসিক অবস্থারও প্রতীক। যেমন উপগ্রহ নিজস্ব গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনি পুতলিও নিজের ইচ্ছা, অনুভূতি বা স্বপ্ন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে না। সে অভিভাবকের আকাঙ্ক্ষার মহাকর্ষে আবর্তিত এক নিয়ন্ত্রিত সত্তায় পরিণত হয়। এই প্রতীক শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হারানোর গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে প্রকাশ করে।

এছাড়া এই গল্পে আত্মপরিচয়ের সংকট স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পুতলি নিজেকে একজন স্বাভাবিক শিশু হিসেবে নয় বরং একটি 'বিশেষ প্রতিভা' হিসেবে দেখতে বাধ্য হয়। ফলে তার আত্মপরিচয় বাইরের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যখন বাস্তব সামাজিক পরিবেশে সেই স্বীকৃতি কার্যকর হয় না, তখন তার মধ্যে বিভ্রান্তি, অনিরাপত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের সংকট তৈরি হয়। এই অবস্থাই তার মানসিক যন্ত্রণাকে আরও তীব্র করে তোলে।

অতএব, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে 'পুতলি' গল্পটিতে শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশ, ব্যক্তিসত্তার নির্মাণ, আবেগগত বিকাশ এবং আত্মপরিচয়ের সংকটকে গভীর মানবিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশুকে যদি কেবল সাফল্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশকে উপেক্ষা করা হয়, তবে সে বাহ্যিকভাবে সফল হলেও অন্তর্গতভাবে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই 'পুতলি' কেবল একটি শিশুর গল্প নয়, এটি আধুনিক সমাজে শিশুমনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের এক গভীর সাহিত্যিক দলিল।

শ্যামল ভট্টাচার্যের অন্যতম 'টিম্ব' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এটি মূলত শোক, পারিবারিক দায়বোধ, বিশ্বাসের সংকট,

অপরাধবোধ এবং ব্যক্তিমানসের অন্তর্দ্বন্দ্বের গল্প হিসেবে প্রতিভাত হয়। গল্পটির বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহ একটি মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এর অন্তর্নিহিত স্তরে মানুষের মানসিক টানাপোড়েন, সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং আবেগগত সংকট অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রূপায়িত হয়েছে।

এই গল্পে বাবার মৃত্যুর পর সন্তানদের মানসিক অবস্থার চিত্রায়ন প্রধান হয়ে ওঠে। মৃত্যুশোকের পাশাপাশি তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, পারিবারিক কর্তব্য এবং সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের চাপ একসঙ্গে কাজ করে। এই পরিস্থিতিতে তাদের সিদ্ধান্ত ও আচরণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে চরিত্রগুলির মধ্যে এক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে তারা বাবার আদর্শ ও যুক্তিবাদী জীবনদর্শনকে স্মরণ করে, অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য হয়। এই দ্বৈত অবস্থান তাদের অবচেতন মনে অপরাধবোধ, সংশয় এবং অস্থিরতার জন্ম দেয়।

টিম্ব গল্পটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো জ্ঞানগত দ্বন্দ্ব (Cognitive Dissonance)। মৃত বাবা জীবদ্দশায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করলেও মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানরাই সেই আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। তাদের বিশ্বাস ও আচরণের এই অসামঞ্জস্য মানসিক অস্বস্তির সৃষ্টি করে। তারা জানে যে বাবার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল, তবু তারা সামাজিক নিন্দা ও পারিবারিক দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতাকে গভীরভাবে প্রকাশ করে। শোকের মনস্তত্ত্বও গল্পে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাবার অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট শূন্যতা, অতীতের স্মৃতি, সম্পর্কের মূল্য এবং জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে চরিত্রগুলিকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থায় মানুষ একদিকে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে, অন্যদিকে আবেগের স্তরে প্রিয়জনের অনুপস্থিতিকে অস্বীকার করতে চায়। চরিত্রগুলির নীরবতা, স্মৃতিচারণ, অন্তর্মুখী চিন্তা এবং শোক মনস্তত্ত্বেরই শিল্পিত প্রকাশ।

এই গল্পে মহাপুরোহিতের উপস্থিতিও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে। তাঁর আচরণ অন্যান্য চরিত্রের মনে ধর্মীয় আচার সম্পর্কে এক ধরনের হতাশা ও মানসিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। যে অনুষ্ঠানকে তারা গভীর আবেগের সঙ্গে সম্পন্ন করতে চায়, সেখানে পুরোহিতের যান্ত্রিক ও পেশাদার আচরণ তাদের আবেগকে আঘাত করে। এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংঘর্ষ ঘটে এবং চরিত্রগুলির মধ্যে বিশ্বাসের সংকট আরও তীব্র

হয়ে ওঠে। গল্পে দমনকৃত আবেগের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তিগত শোককে প্রকাশ করার পরিবর্তে আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। ফলে তাদের প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ সংকুচিত হয়। এই আবেগ-দমন তাদের মানসিক চাপকে আরও গভীর করে তোলে। বাহ্যিকভাবে তারা শান্ত ও সংযত থাকলেও অন্তর্গতভাবে তারা শোক, অসহায়তা এবং শূন্যতার সঙ্গে লড়াই করে চলে।

এছাড়া গল্পে অস্তিত্বগত উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। বাবার মৃত্যু চরিত্রগুলিকে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, মানুষের অসহায়তা এবং মৃত্যুর অনিবার্যতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই উপলব্ধি তাদের আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং জীবন, সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়। ফলে মৃত্যু তাদের মধ্যে আত্মঅনুসন্ধানের সূচনা ঘটায়। 'টিম্ব' গল্পটি মানুষের শোক, অপরাধবোধ, বিশ্বাসের সংকট, আবেগগত দমন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে গভীর শিল্পসচেতনতার সঙ্গে উপস্থাপন করে। মানুষের মানসিক জগৎ কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সামাজিক রীতি, পারিবারিক দায়বদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও মানুষের মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই 'টিম্ব' গল্পটি শোক ও মানবমনের জটিলতার এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান হিসেবে বাংলা ছোটগল্পে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

'জামিছলঙ' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এটি মানুষের দারিদ্র্যজনিত মানসিক সংকট, মাতৃত্ববোধ, অসহায়তা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব এবং জীবনসংগ্রামের এক গভীর মানবিক আখ্যান হিসেবে প্রতিভাত হয়। গল্পটির বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহে দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং সামাজিক বৈষম্যের চিত্র থাকলেও এর অন্তর্গত স্তরে মানুষের মানসিক জগৎ, আবেগ, ভয়, স্বপ্ন এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রূপায়িত হয়েছে। ফলে গল্পটি মানুষের অন্তর্জগতের জটিলতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক প্রকাশ। গল্পে একজন মায়ের মাতৃত্বের মানসিক দ্বন্দ্বকেও দেখানো হয়েছে। ভগবতী অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নিজের সন্তানকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করে অন্যের সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতি তার মধ্যে গভীর অপরাধবোধ এবং অসহায়তার জন্ম দেয়। একদিকে মাতৃত্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে নিজের সন্তানের প্রতি টেনে নিয়ে যায়, অন্যদিকে জীবিকার প্রয়োজনে সে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এই দ্বৈত মানসিক অবস্থা চরিত্রটির অন্তর্দহনকে গভীরভাবে প্রকাশ করে এবং দেখায় যে চরম দারিদ্র্য মানুষের

স্বাভাবিক আবেগকেও সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। তাছাড়া বুলবুলির অসুস্থতা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয় সৃষ্টি করে। উন্নত চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে না পারার কারণে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং বিকল্প পথের সন্ধান করতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে। আধুনিক চিকিৎসা ও লোকবিশ্বাস নিয়ে তাদের দোদুল্যমানতা এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেরও বহিঃপ্রকাশ।

আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব এই গল্পের চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একদিকে তারা আধুনিক চিকিৎসার প্রতি আস্থা রাখতে চায়, অন্যদিকে আর্থিক অক্ষমতা তাদের লোকচিকিৎসা ও ওঝার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। এই অবস্থায় যুক্তি ও বিশ্বাস পাশাপাশি চলতে থাকে। মানুষের মন সংকটের মুহূর্তে এমন এক আশ্রয়ের সন্ধান করে, যা তাকে অন্তত মানসিক সান্ত্বনা দিতে পারে। কেরাঙ কবিরাজ বা ওচাইয়ের প্রতি আস্থা সেই মানসিক নির্ভরতারই প্রতিফলন। এখানে লোকবিশ্বাস শুধুমাত্র ধর্মীয় আস্থাই নয় এটি সংকটগ্রস্ত মানুষের মানসিক নিরাপত্তা অর্জনের একটি উপায়। গল্পে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও বঞ্চনাবোধেরও গভীর প্রকাশ ঘটেছে। একটি লেপ কেনার মতো সাধারণ ইচ্ছাও চরিত্রগুলির কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। এই অভাববোধ কেবল বস্তুগত নয় এটি মানসিক নিরাপত্তা, মর্যাদাবোধ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা মানুষের মনে হীনম্মন্যতা, হতাশা এবং আত্মঅবিশ্বাসের জন্ম দেয়। গল্পে এই মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা অত্যন্ত সংযত অথচ শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাস্তবতা থেকে সাময়িক মানসিক পলায়ন। সিনেমা, ভিডিও এবং জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের নায়িকাদের কল্পনা চরিত্রগুলির মনে এক ভিন্ন জগতের সৃষ্টি করে। কঠিন বাস্তব জীবনের দুঃখ, অভাব এবং যন্ত্রণার মধ্যে এই কল্পনার জগৎ তাদের সাময়িক মানসিক স্বস্তি দেয়। মনোবিজ্ঞানের আলোকে এটি একটি প্রতিরক্ষা-কৌশল বলে, যার মাধ্যমে মানুষ কঠিন বাস্তবতার চাপ থেকে সাময়িক মুক্তি লাভের চেষ্টা করে। প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। 'জামিছলঙ' কেবল একটি স্থান বা ঘটনার নাম নয় এটি মানুষের অনিশ্চিত জীবন, দুঃখ, আশা এবং টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতীক। একইভাবে ভগবতীর দুধ মাতৃত্ব, আত্মত্যাগ এবং মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক। অসুস্থ বুলবুলি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের প্রতীক, আর লেপ নিরাপত্তা, স্বস্তি ও মানবিক উষ্ণতার প্রতীক হিসেবে গল্পে বিশেষ অর্থ বহন করে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে 'জামিছলঙ' গল্পে মানুষের অন্তর্গত আবেগ, মাতৃত্বের দ্বন্দ্ব, দারিদ্র্যজনিত মানসিক চাপ, অসহায়তা, আশা-নিরাশার সংঘাত এবং বেঁচে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পবোধের সঙ্গে রূপায়িত করা হয়েছে। শ্যামল ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, মানুষের মানসিক জগৎ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাহ্যিক দারিদ্র্যের চেয়েও গভীর হলো সেই দারিদ্র্য, যা মানুষের মনকে প্রতিনিয়ত ভেঙে দেয়, আবার একই সঙ্গে তাকে বেঁচে থাকার শক্তিও জোগায়। এই কারণেই 'জামিছলঙ' বাংলা ছোটগল্পে মানবমনের জটিলতা ও জীবনসংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪

শ্যামল ভট্টাচার্যের 'ভারোং পাখির নাচ' গল্পগ্রন্থের 'ধোবামুনি কিম্বা ডাইনোর জিন' গল্পটি মূলত মানুষের অবচেতন মন, নৈতিক সংকট, স্মৃতির অভিঘাত এবং ব্যক্তিসত্তার গভীর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের এক অসাধারণ শিল্পরূপ। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তমাল একজন সরকারি কর্মচারী এবং সংবেদনশীল মানুষ। তার ব্যক্তিগত স্মৃতি, সামাজিক দায়িত্ব, ন্যায়বোধ এবং মানবিক সহমর্মিতা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। ফলে গল্পটি বহির্জগতের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের অন্তর্জগতের সংকটকে উন্মোচিত করে। গল্পের শুরুতেই তমালের স্নানের দৃশ্য এবং বাঁশি-তবলারের সুরের মধ্যে তার কৈশোরের স্মৃতি ফিরে আসা মনোবিজ্ঞানের অ্যাসোসিয়েটিভ মেমোরির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একটি নির্দিষ্ট শব্দ, সুর কিংবা পরিবেশ কীভাবে মানুষের অবচেতন মনে চাপা পড়ে থাকা অতীত অভিজ্ঞতাকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলে, লেখক তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন। বৃষ্টির শব্দ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবের সেই ভয়াবহ বজ্রপাতের ঘটনায়, যেখানে বন্ধু হাবুলের মৃত্যু তার চোখের সামনে ঘটে। এই আকস্মিক মৃত্যু তমালের মনে মানসিক আঘাত সৃষ্টি করেছে, যা দীর্ঘদিন পরেও তার অবচেতন মনে সক্রিয় রয়েছে। তাই প্রতিবার বজ্রপাতের শব্দ শুনলেই সে অতীতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে ফিরে যায়। এটি দীর্ঘস্থায়ী ট্রমার এক বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ। হাবুলের মৃত্যুর স্মৃতি তমালের মনে অপরাধ বোধেরও জন্ম দেয়। সে নিজে বেঁচে গেছে, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৃত্যুবরণ করেছে। এই মানসিক ক্ষত তার চেতনাকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়ায়। বহু বছর ধরে সংরক্ষণ করে রাখা হাবুলের প্যান্টটি বারবার বের করে গন্ধ খোঁজার চেষ্টা আসলে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে স্মৃতির ভেতর জীবিত রাখার প্রয়াস। এখানে বস্তুটি কেবল একটি পোশাক নয় এটি তমালের

অসমাপ্ত আবেগ, বন্ধুত্ব এবং অপরাধবোধের প্রতীক। মনোবিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এটি বস্তুনির্ভর স্মৃতির একটি লক্ষণ, যেখানে মানুষ কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে ধরে রাখতে চায়।

গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো নৈতিক দ্বন্দ্ব। সরকারি কর্মচারী হিসেবে তমালের দায়িত্ব আইন ও বিধি অনুসরণ করা, কিন্তু একই সঙ্গে সুরেন্দ্র কাকুর অসহায় জীবন তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। একদিকে আইন, অন্যদিকে মানবিকতা এই দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষ তমালের মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়। সারারাত তার ঘুম না হওয়া, বারবার সিগারেট খাওয়া, পায়চারি করা, মাথাব্যথা, বমিভাব এসবই তার তীব্র মানসিক উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ। মনোবিজ্ঞানী লিওন ফেস্টিঙ্গারের (Leon Festinger) Cognitive Dissonance তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন একজন মানুষের বিশ্বাস ও বাস্তব সিদ্ধান্তের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়, তখন তার মধ্যে প্রবল মানসিক অস্বস্তি কাজ করে। তমালের অবস্থাও ঠিক তেমন। সে জানে আইন কী বলছে, আবার মানবিক বিবেক তাকে অন্য সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই দ্বৈত টানাপোড়েনই তার মনোজগৎকে অস্থির করে তোলে। সুরেন্দ্র কাকুর বিকৃত শরীর এবং ঝলসে যাওয়া মুখ তমালের মনে শুধু সহানুভূতি জাগানোর পাশাপাশি তার অতীতের ট্রমাকে পুনরুজ্জীবিত করে। মনোবিজ্ঞানে একে ট্রমাটিক ট্রিগার বলা হয়। সুরেন্দ্র কাকুর পোড়া শরীর দেখে তমালের মনে হাবুলের দগ্ধ দেহের স্মৃতি ফিরে আসে। ফলে বর্তমান এবং অতীত একাকার হয়ে যায়। বাস্তব ও স্মৃতির এই মিশ্রণ তমালের মানসিক ভারসাম্যকে নড়বড়ে করে দেয়।

তমালের স্বপ্ন ও কল্পনা তার অবচেতন মনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। অসুস্থ অবস্থায় সে বিশাল তক্ষকসদৃশ প্রাণী, অন্ধকার সমুদ্র, জেলিফিশ, বিষাক্ত পোকা এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দৃশ্য দেখে। এসবই তার দমিত ভয়, মৃত্যু-আশঙ্কা এবং সামাজিক অস্থিরতার প্রতীকী রূপ। সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-এর মতে, স্বপ্ন মানুষের অবদমিত অনুভূতির প্রতীকী প্রকাশ। তমালের স্বপ্নেও সেই অবদমিত ভয়, অপরাধবোধ এবং অসহায়তা রূপক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং (Carl Gustav Jung)-এর ভাষায়, তক্ষক, ডাইনোসর কিংবা আদিম প্রাণীর মতো প্রতীকগুলো মানুষের সমষ্টিগত অবচেতনের আদিরূপ বহন করে। এই গল্পে তক্ষক শুধু একটি প্রাণী নয়, এটি মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার দীর্ঘ বিবর্তন, টিকে থাকার সংগ্রাম এবং বিলুপ্তির আশঙ্কারও প্রতীক। গল্পে তমালের কন্যা রিয়ার উপস্থিতি মনস্তাত্ত্বিক

ভারসাম্যের একটি ইতিবাচক উপাদান। রিয়ার সরল প্রশ্ন, শ্রীলার স্নেহ এবং পারিবারিক উষ্ণতা তমালের মানসিক অস্থিরতাকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে। বিশেষ করে শ্রীলার গল্প বলা, সঙ্গীত বাজানো এবং রিয়ার স্নেহময় আচরণ তমালের মধ্যে মানসিক পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে। ফলে দীর্ঘ দ্বন্দ্বের পর সে নিজের ভেতরে একটি নতুন জীবনদর্শন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়।

গল্পের সমাপ্তিতে তমালের উপলব্ধি—"এখন থেকে ওর সমস্ত সিদ্ধান্ত হবে আপেক্ষিক"[২] আসলে তার মনস্তাত্ত্বিক পরিণতির প্রকাশ। শুরুতে সে ন্যায়নীতি ও নিয়মের কঠোর অনুসারী ছিল কিন্তু জীবনের জটিল বাস্তবতা, মানুষের দুর্ভোগ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে আরও নমনীয় ও মানবিক করে তোলে। এটি তার মনস্তাত্ত্বিক পরিপক্কতার লক্ষণ। একই সঙ্গে তক্ষককে ডাইনোসরের বংশধর বলে মেনে নেওয়া এবং তাদের সংরক্ষণের প্রসঙ্গ তোলার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বসংকট, বিলুপ্তির ভয় এবং দুর্বল মানুষের প্রতি সহমর্মিতার প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, 'ধোবামুনি কিম্বা ডাইনোর জিন্' গল্পে মানুষের অবচেতন মন, ট্রমা, স্মৃতি, অপরাধবোধ, নৈতিক সংকট মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। তমালের চরিত্র দেখায়, মানুষের সিদ্ধান্ত কেবল আইন, যুক্তি বা সামাজিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। ব্যক্তিগত স্মৃতি, মানসিক আঘাত, সহমর্মিতা এবং অবচেতনের গভীর অনুভূতিও সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

'সাইবার ব্যূহ' গল্পে শ্যামল ভট্টাচার্য সমকালীন প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে মানুষের মনোজগতের জটিলতা, ভার্চুয়াল সম্পর্কের আকর্ষণ, যৌনতা, নিঃসঙ্গতা, পরিচয়-সংকট এবং অপরাধবোধকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। গল্পটি আধুনিক মানুষের অবচেতন মন, আকাঙ্ক্ষা, ভয় এবং মানসিক ভাঙনের মনস্তাত্ত্বিক দলিল। প্রযুক্তি মানুষের মনস্তত্ত্বকে যেমন নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করায়, তেমনি বাস্তব ও ভার্চুয়াল জগতের সীমারেখাকেও অস্পষ্ট করে তোলে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সূর্য একজন মেধাবী, উচ্চাভিলাষী এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বাহ্যিকভাবে সে আত্মবিশ্বাসী ও সফল হলেও তার অন্তর্জগৎ গভীরভাবে আবেগপ্রবণ এবং অনভিজ্ঞ। ইন্টারনেটে সঞ্জনার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে তার মনে যে প্রেমের জন্ম হয়, তা মূলত বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিবর্তে কল্পনা ও ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সঞ্জনাকে না দেখেই তাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনা সূর্যের মানসিকতার এক

ধরনের আদর্শায়নের প্রবণতা প্রকাশ করে। বাস্তব মানুষের পরিবর্তে নিজের কল্পনায় নির্মিত এক আদর্শ সত্তাকে সে ভালোবাসতে শুরু করে। প্রযুক্তির এই আবেগনির্ভর সম্পর্ক তাকে বাস্তব বিচারবোধ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেয়।

শেখর মিত্র চরিত্রটি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক মানুষের এক ভিন্ন মানসিকতার প্রতিনিধি। তার কাছে সাইবার সম্পর্ক বাস্তব জীবনের চাপ, একঘেয়েমি ও মানসিক ক্লান্তি থেকে সাময়িক মুক্তির উপায়। সে প্রযুক্তিগত যৌনতাকে বাস্তব বিশ্বাসঘাতকতা মনে না করে মানসিক প্রশান্তির একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিক মানুষের মানসিক প্রতিরক্ষা-কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। শেখর নিজের বিবাহিত জীবনকে অস্বীকার না করেও ভার্চুয়াল সম্পর্কের মাধ্যমে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ফলে তার চরিত্রে যুক্তিবাদ, ভোগবাদ এবং মানসিক অভিযোজনের এক নতুন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সূর্য প্রযুক্তি নির্ভর জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানিয়ে নিতে পারে না। তার মূল্যবোধ, পারিবারিক শিক্ষা এবং আবেগের সঙ্গে সাইবার বাস্তবতার সংঘর্ষ ঘটে। সঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে প্রতারণার শিকার হয়, যা তাকে মানসিকভাবে আঘাত করে। বাস্তব ও প্রযুক্তির পরিচয়ের এই বিভ্রান্তি তার বিশ্বাসবোধকে ভেঙে দেয়। যে নারীকে সে সমবয়সী প্রেমিকা ভেবেছিল, তিনি একজন মধ্যবয়সী নারী। এই ঘটনা সূর্যের মনোজগতে প্রবল ধাক্কা আনে। আকস্মিক যৌন অভিজ্ঞতা, প্রতারণা এবং অপরাধবোধ তার অবচেতনে ভয় ও অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়।

গল্পের শেষাংশে সূর্যের এইচআইভি-পজিটিভ হওয়ার সংবাদ তার মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। সামাজিক অপমান, পারিবারিক মর্যাদা হারানোর ভয়, ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং আত্মপরিচয়ের সংকটে সে আক্রান্ত হয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে অস্তিত্বগত উদ্বেগ বলা যায়। তার সামনে হঠাৎ করে জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে পড়ে। বিদেশযাত্রা, কর্মজীবন, প্রেম, পরিবার সবকিছুই অর্থহীন হয়ে ওঠে। এই আকস্মিক মানসিক আঘাত তাকে গভীর হতাশা ও অসহায়তার দিকে ঠেলে দেয়।

এই গল্পে টিকটিকি বা গিরগিটির প্রতীকটিও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ দৃশ্যে টিকটিকির শরীরে নীল রঙের বিস্তার দেখার মধ্য দিয়ে সূর্যের আতঙ্কগ্রস্ত মনের প্রতিফলন ঘটে। নিজের শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করেছে এই ভয় তার অবচেতন মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, বাইরের জগতও তার কাছে ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিভাত হয়। মনোবিজ্ঞানের

পরিভাষায় এটি Projection এবং Hallucinatory Perception-এর লক্ষণ, যেখানে ব্যক্তি নিজের অন্তর্গত ভয়কে বাইরের বস্তুতে আরোপ করে। টিকটিকির নীল হয়ে ওঠা আসলে সূর্যের নিজের মৃত্যুভয় ও আত্মবিনাশের প্রতীক।

'সাইবার ব্যূহ' মূলত প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সভ্যতার প্রেক্ষাপটে মানুষের মনোজগতের সংকটের শিল্পিত বিশ্লেষণ। এখানে প্রেম, যৌনতা, পরিচয়, ভয়, অপরাধবোধ, নিঃসঙ্গতা এবং অস্তিত্ব-সংকট একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে মানবমনের বহুমাত্রিক রূপ উন্মোচিত হয়েছে। শ্যামল ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, প্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগের নতুন দিগন্ত খুলে দিলেও তা মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। ভার্চুয়াল জগতের মোহ, প্রতারণা এবং অনিশ্চয়তা মানুষকে ক্রমশ এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক গোলকধাঁধায় আবদ্ধ করে।

'অযাচিত' গল্পের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি মূলত মানুষের বিশ্বাস ও যুক্তির সংঘাত, অপরাধবোধ, অস্তিত্বসংকট, মানসিক প্রতিরক্ষা-কৌশল এবং ভালোবাসার মানবিক শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চরিত্রগুলির বাহ্যিক কথোপকথনের আড়ালে তাদের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উন্মোচন করেছেন গল্পকার। গল্পটি মানুষের মনোজগতের জটিল স্তরগুলির এক গভীর অনুসন্ধানের চিত্র ব্যক্ত করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সূর্য একজন যুক্তিবাদী ও সমালোচনামুখর ব্যক্তি। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্যের আচরণকে যুক্তিকরণের মাধ্যমে আত্মরক্ষা এবং আবেগকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। ঋষভ যখন বাস্তুশাস্ত্রের মাধ্যমে সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন সূর্য তার প্রতিটি বক্তব্যকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে। বাস্তবে এই যুক্তিপূর্ণ আচরণের অন্তরালে লুকিয়ে আছে তার গভীর ব্যক্তিগত যন্ত্রণা। এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত জীবন, পারিবারিক বিচ্ছেদ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাকে মানসিকভাবে আঘাত করেছে। তাই সে কুসংস্কার বা ভাগ্যনির্ভর বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদকে নিজের মানসিক আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ঋষভ চরিত্রটি মানুষের অনিশ্চয়তাজনিত ভয় এবং নিরাপত্তার চাহিদাকে পুঁজি করে বাস্তুশাস্ত্রের প্রচার করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, মানুষ যখন জীবনের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কম অনুভব করে, তখন সে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ব্যাখ্যার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। ঋষভ সেই দুর্বল মানসিক অবস্থাকেই ব্যবহার করে মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, সঠিক দিকনির্দেশনা অনুসরণ করলেই সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত।

সঞ্জনা চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব আরও গভীর ও জটিল। তার মধ্যে প্রবল অপরাধবোধ কাজ করে। অতীতের সম্পর্ক, মিস্টার সাঞ্জেনার আত্মহত্যা, নিজের অসুস্থতা, সূর্যের জীবন বিপর্যস্ত হওয়া এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সবকিছুর জন্য সে নিজেকেই দায়ী মনে করে। মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর মতে, অতিরিক্ত অপরাধবোধ মানুষের আত্মসম্মানকে ক্ষয় করে এবং আত্মদণ্ডমূলক মানসিকতার জন্ম দেয়। সঞ্জনার কান্না সেই আত্মদণ্ডমূলক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে, জীবনের প্রতিটি বিপর্যয় যেন তারই পাপের ফল। অথচ এই অপরাধবোধ বাস্তবের চেয়ে মানসিক নির্মাণই বেশি। এখানে সূর্যের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে সঞ্জনাকে বলে, "আমরা কোনও অন্যায় তো করিনি। শুধু ভালোবেসেছি। ভালোবাসা তো অন্যায় নয়।"[৩] এই উক্তি মনোবিজ্ঞানের Cognitive Reframing-এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থাৎ, একই ঘটনাকে নতুন অর্থ প্রদান করে মানসিক কষ্ট কমানোর চেষ্টা। সূর্য অতীতকে অপরাধ হিসেবে নয়, ভালোবাসার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখতে শেখায়। এর মাধ্যমে সে সঞ্জনার আত্মধ্বংসী অপরাধবোধকে কমিয়ে জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চায়।

গল্পটিতে জ্ঞানগত দ্বন্দ্বের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। একদিকে ঋষভ বিশ্বাস করে মানুষের সুখ-দুঃখ বাস্তুশাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে বাস্তব জীবনে তার নিজের গাড়ি চুরি হয়ে যায়। সূর্য এই ঘটনাকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে দেখাতে চায় বিশ্বাস ও বাস্তবতার মধ্যে গভীর অসামঞ্জস্য রয়েছে। এই অসামঞ্জস্যই জ্ঞানগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যা মানুষের মানসিক অস্বস্তির অন্যতম কারণ। এই গল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো অস্তিত্ববাদী মনোবিজ্ঞান। সূর্য ও সঞ্জনা জানে তাদের জীবন সীমিত, রোগ তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে। তবুও তারা বেঁচে থাকার, ভালোবাসার এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল দেখিয়েছেন, মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও জীবনের অর্থ খুঁজে পেলে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করে। গল্পে তাদের কন্যাই সেই অর্থের প্রতীক। তাই সূর্যের সংলাপ— "মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে যে!"[৪] জীবনের প্রতি তার গভীর অঙ্গীকার ও মানসিক স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় বহন করে।

গল্পে বৃষ্টির চিত্রকল্প বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বৃষ্টি এখানে প্রকৃতির অনুষঙ্গ না থেকে চরিত্রদের অন্তর্গত বিষণ্ণতা, অশ্রু, শুদ্ধি এবং অব্যক্ত আবেগের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কাচের ওপারে ঝরে পড়া বৃষ্টিধারা যেমন স্পর্শ করা যায় না তেমনি সূর্য ও সঞ্জনার অন্তর্গত যন্ত্রণাও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা

সম্ভব হয় না। অনুভবই এখানে একমাত্র সত্য। 'অযাচিত' গল্পটি মানুষের মনস্তত্ত্বের এক সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ। গল্পে যুক্তি ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ আছে। তাছাড়া অপরাধবোধ, আত্মরক্ষামূলক মানসিকতা, জ্ঞানগত দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বসংকট এবং ভালোবাসার পুনর্গঠনমূলক শক্তিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্রয় কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। পারস্পরিক ভালোবাসা, আত্মস্বীকৃতি, যুক্তিবোধ এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও অর্থ খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতাই মানুষের প্রকৃত মানসিক মুক্তির পথ।

শ্যামল ভট্টাচার্যের 'ভারোং পাখির নাচ' গল্পটি মূলত স্মৃতি, বিচ্ছেদ, পরিচয়-সংকট, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ট্রমা এবং মানবিক সহমর্মিতার মনস্তাত্ত্বিক দলিল। গল্পে বহির্জগতের ঘটনাপ্রবাহের চেয়ে মানুষের অন্তর্জগতের আলোড়নই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পের প্রতিটি চরিত্র তাদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও আবেগের মধ্য দিয়ে এক জটিল মানসিক বাস্তবতাকে বহন করে। গল্পটি যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ-কাল ও মানবসম্পর্কের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষের মনের ইতিহাস। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিপ্রিয়া দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ, দাঙ্গার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের নিঃসঙ্গতার ফলে আঘাতজনিত মানসিক সংকটের মধ্যে অবস্থান করেন। রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে তাঁর দীর্ঘক্ষণ কান্না, একই গান বারবার গাওয়া কিংবা অতীতের স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া, এসব আচরণ তাঁর দমিত যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি Post-Traumatic Stress Response-এর লক্ষণ, যেখানে অতীতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্তমানেও মানসিকভাবে মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

হরিপ্রিয়ার মনোজগতে স্মৃতি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। বর্তমানের প্রতিটি ঘটনা তাঁকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতার জনসমুদ্র, ব্যস্ততা কিংবা আলো-ঝলমলে নগরজীবন তাঁর কাছে বাস্তবতার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর। ফলে তিনি বারবার অতীতের পরিচিত পাহাড়, কীর্তনের আসর, হরিদাস কিংবা সুদামার স্মৃতিতে আশ্রয় নেন। মনোবিশ্লেষণ অনুযায়ী, অসহনীয় বর্তমান থেকে মুক্তি পেতে মানুষ প্রায়ই অতীতের নিরাপদ স্মৃতিতে ফিরে যায়। হরিপ্রিয়ার ক্ষেত্রেও স্মৃতি একটি মানসিক চাপ মোকাবিলার কৌশল হিসেবে কাজ করে। ভয় তাঁর চরিত্রে একটি স্থায়ী মানসিক অনুভূতি। দাঙ্গার স্মৃতি তাঁর চেতনায় গেঁথে রয়েছে বলে বর্তমানেও তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কুকি লোকগীতির আনন্দময় পরিবেশে আকস্মিক হত্যাযজ্ঞের স্মৃতি তাঁর অবচেতনে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছে। 'ভারোং পাখির নাচ' তাঁর কাছে আনন্দ নয়, মৃত্যুর প্রতীক। তাঁর এই মানসিক রূপান্তর দেখায়, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মানুষের অনুভূতির অর্থও বদলে দিতে পারে। এই গল্পে পরিচয়ের

সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুদামা জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও ত্রিপুরী সমাজে বড় হয়ে ককবরক শিক্ষক হয়েছে এবং ত্রিপুরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তাঁর সন্তানের পরিচয় কী, বাঙালি না ত্রিপুরী, এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে লেখক জাতিগত পরিচয়ের সংকীর্ণ ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। কলাপিনী চরিত্রটি কৌতূহলী, সংবেদনশীল এবং মানবিক মানসিকতার প্রতীক। প্রথমদিকে সে হরিপ্রিয়াকে কেবল এক অসহায় বৃদ্ধা হিসেবে দেখেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের ইতিহাস জানার পর তার মধ্যে গভীর সহানুভূতি জন্ম নেয়। এটি মনোবিজ্ঞানে সহানুভূতিশীল বিকাশের উদাহরণ, যেখানে অন্যের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ব্যক্তির আবেগিক পরিপক্কতা বৃদ্ধি পায়। গল্পের শেষে কলাপিনীর বিষণ্ণতা ও আত্মজিজ্ঞাসা তার মানসিক পরিণতিরই প্রকাশ। অন্যদিকে নিরুপমা ও কালীবাবু মানবিক দায়িত্ববোধের প্রতীক। তাঁরা হরিপ্রিয়াকে কেবল আশ্রয়ই দেন না, বরং তাঁর হারিয়ে যাওয়া পরিচয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তাঁদের আচরণ সামাজিক আচরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে সহানুভূতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা মানুষের মানবিক সত্তাকে বিকশিত করে। লেখক বোঝাতে চান, মানুষের মানসিক ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারস্পরিক সহমর্মিতাই সবচেয়ে কার্যকর শক্তি।

এই গল্পে রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার মনোবিজ্ঞানও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হরিপ্রিয়ার উক্তি— "সাধারণ মানুষ একে অইন্যরে ঘিন্না করে না, রাজনীতির লুকেরা খমতার লুভে মাইনষের মনে ঘিন্না ঢুকায়"[৫] মানুষের মানসিক গঠনে রাজনৈতিক প্রভাবের দিকটি উন্মোচিত করে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে বলা যায়, কৃত্রিমভাবে নির্মিত সামাজিক বিভাজন মানুষের মধ্যে ভীতি, সন্দেহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত জন্ম নেয়। লেখক এই মনস্তত্ত্বকে অত্যন্ত সংযতভাবে উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য গল্পে 'ভারোং পাখি' শুধু একটি লোককাহিনির পাখি নয়, এটি মানুষের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ, সংস্কৃতি, ঐক্য এবং সৃজনশীলতার প্রতীক। যে পাখি একসময় নাচত, সে আজ আর নাচে না এই রূপক মানুষের মানসিক অবসাদ, সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং সহিংসতার ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ শূন্যতাকে প্রকাশ করে। ট্রমা যেমন মানুষের হাসি কেড়ে নেয়, তেমনি সমাজেরও শিল্প, সংগীত ও মানবিকতা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ট্রমাগ্রস্ত মানুষের মনোজগত, স্মৃতির ভার, পরিচয়ের সংকট, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মানসিক অভিঘাত এবং মানবিক সহমর্মিতার গভীর শিল্পরূপ 'ভারোং পাখির নাচ' গল্পে শিল্পিত রূপ পেয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গল্পকার দেখিয়েছেন, মানুষের শরীরের

ক্ষত একসময় শুকিয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতি ও সহিংসতার ক্ষত বহু বছর পরেও মনের গভীরে রক্তক্ষরণ ঘটাতে থাকে। একই সঙ্গে তিনি এই বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠা করেছেন ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যই মানুষের ভগ্ন মানসিকতাকে পুনর্গঠনের একমাত্র পথ।

'নোআর টিলা' যুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতা, মৃত্যুভয়, কর্তব্যবোধ, মানবিকতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষের মানসিক অবস্থার অনুসন্ধানের গল্প। গল্পের বহিরঙ্গ রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও এর অন্তর্নিহিত শক্তি নিহিত রয়েছে চরিত্রগুলির মনোজগতে। সৈনিকের জীবনকে বীরত্বের বাহ্যিক আবরণে না রেখে একজন সংবেদনশীল মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, একাকিত্ব এবং মানবিক চেতনার আলোকে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। এই গল্পের প্রধান চরিত্র হীরেন একজন সৈনিক হলেও তাঁর মানসিক জগৎ অত্যন্ত কোমল ও অনুভূতিপ্রবণ। সামরিক জীবনের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যেও তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন, পূর্ণিমার আলো, সমুদ্রের ঢেউ এবং সবুজ প্রকৃতির মধ্যে মানসিক আশ্রয় খুঁজে পান। যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে সামরিক মুক্তি পেতে তাঁর অবচেতন মন প্রকৃতির মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তির অনুভূতি খোঁজে। তাঁর কাছে 'নোআর টিলা' একটি সামরিক ঘাঁটি নয়, তা ধ্বংসের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এক প্রতীকী আশ্রয়। যুদ্ধজনিত মানসিক আঘাত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে। ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হয়েও হীরেন ও নাম্বুদ্রিপাদ স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করতে পারেন না। শত্রুর আক্রমণের মুখে প্রশাসনিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক বিধিনিষেধ তাঁদের মানসিকভাবে অসহায় করে তোলে। এই দীর্ঘস্থায়ী চাপ তাঁদের মধ্যে দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। ফলে তাঁরা উপলব্ধি করেন, অস্ত্র হাতে থাকলেও তাঁরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নন। এই অসহায়তা তাঁদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসকে ক্রমাগত ক্ষয় করে।

'নোআর টিলা' গল্পে মৃত্যুভয় ও বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির প্রকাশ অত্যন্ত বাস্তব। আকস্মিক গুলিবর্ষণের মুহূর্তে হীরেনের চিন্তার পরিবর্তে তাঁর প্রতিবর্ত ক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি প্রথমেই নাম্বুদ্রিপাদকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন এবং নিজেও প্রাণরক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দেন। সংকটময় মুহূর্তে যুক্তিবোধের পরিবর্তে অবচেতন স্নায়ুতন্ত্র মানুষকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। হীরেনের এই আচরণ তাঁর পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি গভীর মানবিকতারও পরিচয় বহন করে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর হীরেনের চেতনায় মায়ের মুখ, স্ত্রী ব্রততীর স্মৃতি এবং প্যাঁচাটির স্থির চোখ ভেসে ওঠে। মনোবিশ্লেষণ অনুযায়ী, মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখি হলে মানুষের অবচেতন মনে জীবনের সবচেয়ে নিরাপদ ও

আবেগঘন স্মৃতিগুলি ফিরে আসে। যেখানে ব্যক্তি চরম বিপদের সময় মানসিকভাবে প্রিয় মানুষ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই স্মৃতিগুলি তাঁর জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে আরও গভীর করে তোলে।

বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মনস্তত্ত্বও গল্পে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হীরেন ও নাম্বুদ্রিপাদ সহকর্মী হলেও তাঁর সংকটের মধ্যে গড়ে ওঠা গভীর মানসিক বন্ধনের প্রতীক। দীর্ঘ একাকিত্ব, অনিশ্চয়তা ও মৃত্যুভয়ের মধ্যে তাঁরা পরস্পরের উপস্থিতিতে মানসিক শক্তি লাভ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্ককে মনোবিজ্ঞানে রণক্ষেত্রের ভাতৃত্ববোধ সম্পর্কটিকে বোঝায় যেখানে সহযোদ্ধার প্রতি বিশ্বাস ব্যক্তি-মানসকে স্থিতিশীল রাখে এবং ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। জয়চন্দর চরিত্রটি গল্পের মানবিক মনস্তত্ত্বকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। তিনি জাতিগতভাবে তামিল হলেও ভারতীয় সৈনিকদের আন্তরিকভাবে সেবা করেন। গুলিবিদ্ধ হীরেন ও নাম্বুদ্রিপাদের প্রতি তাঁর উদ্বেগ, তাঁদের বিদায়ের সময় চোখের জল কিংবা পরে তাঁদের স্মরণ করে আবেগপ্রবণ হওয়া সবই গভীর সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক সংঘাত মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলেও মানবিক অনুভূতি সেই বিভাজনকে অতিক্রম করতে পারে।

এই গল্পে প্রকৃতি একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, সমুদ্র, গাছপালা, পাখি কিংবা 'নোআর নৌকা'র উপমা চরিত্রগুলির অন্তর্জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ধ্বংস, যুদ্ধ ও মৃত্যুর মধ্যেও প্রকৃতি এক ধরনের মানসিক পুনর্জন্মের সম্ভাবনা তৈরি করে। প্রকৃতির এই নিরাময়কারী ভূমিকা মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মানসিক ক্লান্তি ও উদ্বেগ লাঘব করে। গল্পের শেষাংশে সুনামি একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রতীক হয়ে ওঠে। যুদ্ধ, জাতিগত বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক সংঘাত যেখানে মানুষকে বিভক্ত করেছিল, সেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সকল বিভাজনকে অর্থহীন করে দেয়। বহু বছর পর ত্রাণ নিয়ে ফিরে এসে হীরেন ও নাম্বুদ্রিপাদ যখন জয়চন্দরকে খুঁজে পান না এবং তাঁর পরিবারের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারেন, তখন তাঁদের মনে অপরাধবোধ, শোক এবং অসহায়তার সম্মিলিত অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এটি Survivor's Guilt-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তাঁরা বেঁচে আছেন, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে একসময় জীবনের গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তাঁরা আর নেই। এই উপলব্ধি তাঁদের মানসিকতাকে আরও পরিণত করে।

গল্পের সমাপ্তিতে যুবকের চারপাশে কুকুর, বাঁদর, খরগোশ, সাপ, পাখি এবং নানা প্রাণীর সমবেত উপস্থিতি 'নোআর নৌকা'র প্রতীকের পুনরাবৃত্তি। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি মানুষের যৌথ অবচেতনের প্রতীক, যেখানে ধ্বংসের পরও জীবন নিজেকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করে। প্রকৃতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, মানুষ হারিয়ে গেলেও জীবনের প্রবাহ থেমে থাকে না। এই উপলব্ধি গল্পটিকে অস্তিত্ববাদী তাৎপর্য প্রদান করেছে।

৫

শ্যামল ভট্টাচার্যের গল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংযত ভাষা, বাস্তবধর্মী বর্ণনা এবং চরিত্রের মনোজগতের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান। তিনি অপ্রয়োজনীয় আবেগের আশ্রয় না নিয়ে স্বাভাবিক জীবনচিত্রের মধ্যেই মানুষের গভীরতম অনুভূতি, সংকট ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি কোনো আদর্শিক কাঠামোর প্রতিনিধি নয়, সময়, সমাজ ও পরিস্থিতির অভিঘাতে নির্মিত বাস্তব মানুষ। এই কারণেই তাঁর গল্পের চরিত্র ও ঘটনাবলি পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

সবশেষে বলা যায়, শ্যামল ভট্টাচার্যের ছোটগল্প বাংলা কথাসাহিত্যে সমকালীন জীবন ও মানবমনের এক মূল্যবান দলিল। বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের সার্থক সমন্বয় তাঁর গল্পকে সাহিত্যিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, মানুষ এবং সময়কে বোঝার একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রদান করেছে। মানুষের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম অনুধাবন, সমকালীন বাস্তবতার নির্মোহ উপস্থাপনা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার শ্যামল ভট্টাচার্যকে সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের একজন স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য শ্যামল, জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশানস, কলকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ: ১৮
২. ভট্টাচার্য শ্যামল, ডারোং পাখির নাচ, অক্ষর পাব্লিকেশানস, কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৭, পৃ: ১৮
৩. তদেব, পৃ: ৩৬
৪. তদেব, পৃ: ৩৬
৫. তদেব, পৃ: ৫২

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য শ্যামল, জামিছলঙ, অক্ষর পাব্লিকেশানস, কলকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯

২. ভট্টাচার্য শ্যামল, ভারোং পাখির নাচ, অক্ষর পাব্লিকেশানস, কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, মনোবিজ্ঞান, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলকাতা ৯, প্রথম মূদ্রণ জুন ১৯৬৪

২. দত্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ, মনস্তত্ত্ব ও মনোজয়, রোমাঞ্চ প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৬

৩. সরকার, সুনীল কুমার, ফ্রয়েড, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলিকাতা ৫৯, প্রথম সংস্করণ ১৯২২